সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র

৮ম বর্ষ, ০৩ সংখ্যা, জুন ২০২২ | web: www.spbm.org | মূল্য ৫ টাকা

ব্যবসায়ীদের বাজেট
জনগণকে সুরক্ষা দেবে কি?

২০২০ ও ২০২১, করোনা মহামরি চলাকালীন এ দুই বছরে নতুন করে দরিদ্র হয়েছে সাড়ে তিন কোটি মানুষ। ১০ কোটি ২২ লাখ মানুষের আয় কমেছে। মাঝারি, ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩৭ শতাংশ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। ফলে ২০২২-২৩ সালের বাজেটে এমনিতেই সামাজিক সুরক্ষা খাতে বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজনীয় ছিলো। প্রয়োজনীয় ছিলো নিত্য প্রযোজনীয় দ্রব্য ও পরিষেবা ভর্তুকি মূল্যে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য বরাদ্দ। প্রয়োজনীয় ছিলো বিলাসদ্রব্যে কর বসানো, সেগুলোর আমদানি নিরুৎসাহিত করা ও কর্পোরেট কর বৃদ্ধির মাধ্যমে অতি ধনী গোষ্ঠীর কাছ থেকে বেশি পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা।

কিন্তু ঘটছে তার উল্টোটা। মহামারি চলাকালীন বাজেটে আমরা দেখেছি সরকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে ভর্তুকি না দিয়ে দিয়েছেন বড় বড় ব্যবসায়ীদের। গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা বেশি সুবিধা পাচ্ছেন অভিযোগ করে অন্যান্য খাতের শিল্পপতিরা তাদের হক চাইলেন। সরকারী নীতিনির্ধারকরা তাদের সাথে সমঝোতা বৈঠক করলেন। এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, রাষ্ট্রীয় তহবিলের একচ্ছত্র মালিকানা ব্যবসায়ীদের, যদিও সেটা তৈরি হয় জনগণের করের টাকায়। গেলো গেলো রব তুলে ব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রীয় তহবিলের টাকা ভাগ করে নেয়ার জন্য যে দৌড়ঝাঁপ শুরু করলেন, অচিরেই প্রমাণিত হলো সেগুলো ছিলো অভিনয়মাত্র। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরেই, অর্থাৎ করোনা সংক্রমণের মধ্যেই দেখা গেলো যে, আগস্ট মাসে ৩৩৬ কোটি ৩৩ লক্ষ ডলারের তৈরি পোষাক রপ্তানী হয়েছে যা ২০১৯ সালের একই সময়ের চেয়ে ৪৭ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ করোনাকালে ব্যবসা কমেনি, বেড়েছে।

কিন্তু তাতে গার্মেন্টসের ছাঁটাই বন্ধ হলো না। করোনার সময় ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন চালালেও এর বিপরীতে বাঁচার মজুরিও শ্রমিকরা পেলেন না। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করা প্রায় ৫ কোটি শ্রমিক অর্ধভুক্ত, অভুক্ত অবস্থায় ২ পৃষ্ঠায়

সর্বজনীন রেশন ও খাদ্যপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রচার-সমাবেশে পুলিশের বাধা, জনগণের সমর্থন

৪ জুন, শনিবার। ঢাকায় বাহাদুর শাহ্ পার্কে সূত্রাপুর আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সভা হচ্ছিলো। স্থানীয় মানুষ শুনছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) সংগঠকদের বক্তব্য। এই নেতাকর্মীরা তাদের কাছে নতুন নন। কিছুদিন আগেও এই বাহাদুর শাহ্ পার্কে শত শত দর্জি শ্রমিকদের জড়ো হতে তারা দেখেছেন মজুরি বৃদ্ধির দাবি নিয়ে। রেডিমেইড দর্জি শ্রমিকরা কোনরকমে বেঁচে থাকার মুজুরি যখন পাচ্ছিলেন না, তখন এরাই দর্জি শ্রমিকদের সংগঠিত করে লড়াই করেছেন। আন্দোলনের চাপে দর্জি শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছিলো। ফলে এই এলাকার চায়ের দোকানদার থেকে সদরঘাটের শ্রমিক– তারা জানেন এই দল কাদের দাবি নিয়ে রাস্তায় থাকে।

সমাবেশ চলার এক পর্যায়ে পুলিশ সমাবেশে বাধা দেয়। দ্রব্যমূল্য নিয়ে দলের উদ্যোগে দেশের জেলায় জেলায় দুই মাস ধরে যে প্রচার অভিযান চলছে তাতে স্থানে স্থানে এই বাধা এসেছে। কিন্তু সূত্রাপুরে আরেক চিত্র দেখা গেলো। নেতাকর্মীরা ছুটে যাওয়ার আগেই সমাবেশে দাঁড়ানো মানুষ পুলিশের সামনে দাঁড়ালেন। প্রতিবাদ করলেন। বললেন, সমাবেশ করতে দিতে হবে। তাদের বাধার মুখে পুলিশ সরে যেতে বাধ্য হলো।

শুধু এই ঘটনাই নয়। সারাদেশে এই দলের নেতাকর্মীরা যখন সমাবেশে বক্তব্য রেখেছেন, পথচারীরা থেমে দাঁড়িয়েছেন, কথা শুনেছেন। কোথাও দলের হয়েতো পাঁচজন সংগঠক দাঁড়িয়েছেন। একজন বক্তব্য দিচ্ছেন, এক-দু'জন দলের দাবি লেখা ফেস্টুন নিয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ প্রচারপত্র বিলি করছেন। দলের সংগঠকদের দেয়া সেই বক্তব্য মানুষকে টেনেছে। শুধু দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, মানুষ খেতে ৫ পৃষ্ঠায়

নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য নয়

দেশে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্যে মানুষ বসবাস করছে। একদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সকল পরিষেরার মূল্যবৃদ্ধির কারণে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, অন্যদিকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়া–এই পরিস্থিতিতে এ দেশের মানুষ আজ একেকটা দিন অতিক্রম করছে। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে দেশের শ্রমিক-কৃষকসহ মেহনতি মানুষ যারা প্রকৃতপক্ষে নিজের শ্রম দিয়ে এই উৎপাদন করে। তাদের সস্তা শ্রম শোষণ করে ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিশ্রেণি সম্পদের পাহাড় গড়েছে। কোটিপতি, অতিধনীদের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। অপরদিকে বেঁচে থাকার মতো মুজুরির জন্য শ্রমিকরা রাস্তায় নামছে, পুলিশের মার খাচ্ছে। এই তীব্র মূল্যবৃদ্ধির বাজারে শ্রমিকদের আয় একটুও বাড়েনি। তারা মজুরি কম পাচ্ছে, অভুক্ত থাকছে। তাদের কাজের নিশ্চয়তা নেই, চিকিৎসা নেবার সামর্থ্য নেই। অগ্নিকাণ্ডে, ভবন ধ্বসে, সড়ক দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি মারা যাচ্ছে তারাই। তাদের শ্রমে দেশ চলে, অর্থনীতির চাকা ঘুরে। অথচ দেশের মধ্যে তারাই সবচেয়ে অনিরাপদ, তাদের ভবিষ্যতই সবচেয়ে অনিশ্চিত, তাদের জীবনই সবচেয়ে সস্তা।

এর বিপরীতে বড় বড় কয়েকটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী গোটা দেশ নিয়ন্ত্রণ করছে। তাদের মুনাফার স্বার্থেই দেশের সমস্ত নীতি নির্ধারণ করা হচ্ছে। এই ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে, তাদের সমর্থনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ, কিন্তু এই ক্ষুব্ধতাকে আন্দোলনের ভাষা দেয়ার মতো সঠিক রাজনৈতিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণ সাংগঠনিক সামর্থ্য নিয়ে রাজনীতির মাঠে নেই।

ফলে জনমনে একটা হতাশা আছে। দেশের বৃহত্তম বিরোধী দল বিএনপি। কিন্তু শ্রেণিগতভাবে বিএনপিও বৃহৎ ব্যবসায়ী শ্রেণিরই প্রতিনিধিত্বকারী দল। আওয়ামী লীগের সাথে তাদের নীতিগত প্রভেদ নেই, কিন্তু ক্ষমতার বাইরে থাকার কারণে তারা জুলুমের শিকার হচ্ছে। বিএনপি'র নেতাকর্মীরা ব্যাপকভাবে নির্যাতিত হওয়ার কারণে মানুষ খানিকটা তাদের ব্যাপারে সংবেদনশীল। কিন্তু বিএনপি ক্ষমতায় আসলেও মূল্যবৃদ্ধিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক সংকট দূর হওয়ার কোন আশা নেই, দেশের মেহনতি মানুষের জীবন পরিবর্তনেরও কোন সম্ভাবনা নেই।

এ সত্ত্বেও, ক্ষমতায় যে-ই আসুক না কেন, আওয়ামী লীগের ক্ষমতা ত্যাগ ও দ্রুত একটি আপেক্ষিকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এখন সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক দাবি। কারণ পরপর দুটি জাতীয় নির্বাচনে জনগণ তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার মধ্যেও জনগণের যতটুকু প্রতিনিধিত্ব থাকে সেটা থেকেও তাকে বঞ্চিত করার কারণে মানুষের মর্যাদা আহত হয়েছে। ফলে রাজনৈতিক প্রশ্ন অর্থনৈতিক প্রশ্নের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে সরকারবিরোধী যত জোট কিংবা দলই থাকুক না কেন, প্রধান দাবি সকলেরই এক, সেটি হলো– নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

আওয়ামী লীগের দিক থেকে একটি সাজানো নির্বাচনেরই পাঁয়তারা চলছে। এটা ঠেকাতে হলে ও নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে হলে আওয়ামী লীগকে বাধ্য করতে হবে। বাধ্য করা যায় আন্দোলনের মাধ্যমে। কিন্তু বাধ্য করার মতো সেই পরিমাণ তীব্রতা নিয়ে গণআন্দোলন দেশে অনুপস্থিত। গণতান্ত্রিক আন্দোলন কাঙ্ক্ষিত তীব্রতা

সাম্যবাদ

উন্নয়নের ফানুস

৩য় পৃষ্ঠার পর

সর্বোচ্চ। খেয়াল করুন, ২০১২ সাল থেকে বাৎসরিক ঋণবৃদ্ধির পরিমাণও বেড়েছে।

ফলে এটা স্পষ্ট যে, এই প্রকল্পগুলো নেয়ার পেছনে একটা প্রকল্প আছে। যারা এই টাকা লুটপাট করে ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নিলেন তারা তো নিলেন, এখন এই বিপুল পরিমাণ ঋণের ভবিষ্যৎ কী? ২০২৫ ও ২০২৬ সাল থেকে মেগা প্রকল্পগুলোর ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হবে। অর্থনীতিবিদ মইনুল ইসলামের মতে, ঋণের কিস্তি ২০২৫ সালের মধ্যেই ৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। এটা শুধু বৈদেশিক ঋণ। এর সঙ্গে বিশাল অভ্যন্তরীণ ঋণ যুক্ত আছে। সেটা যোগ করলে বাংলাদেশের ঋণ ও জিডিপির অনুপাত ৫০ শতাংশের উপরে চলে যাবে। এই বিপজ্জনক অবস্থার দিকে আমরা দ্রুত এগোচ্ছি। ফলে বাংলাদেশের অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো নয়, বাংলাদেশের সেরকম কিছু হবেনা– সরকারি এই ভাষ্য পায়ের নিচে মাটি পাচ্ছে না। এই আশ্বাসের পাশাপাশি সরকার তিনটি নির্দেশ জারি করেছেন যা এই আশ্বাসকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সরকার বিলাসদ্রব্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন, অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাদ দিতে বলেছেন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। এই পদক্ষেপগুলো খুব স্পষ্টভাবে রিজার্ভ সংকটকে নির্দেশ করে। দেশে ক্রমাগত বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়া, রেমিট্যান্স কমে যাওয়া ইত্যাদির পাশাপাশি দুই বছর পরে যখন ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হবে তখন পরিস্থিতি কোথায় যেতে পারে তা অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের অর্থনীতির শক্ত অবস্থান বোঝানোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়। জিডিপি কিংবা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির যে হিসাব সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হয়, সেটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে খুব সামান্যই ইঙ্গিত দিতে পারে। শ্রীলঙ্কায় দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালের মধ্যে ৪ দশমিক ১ শতাংশে নেমে এসেছিল। ১৯৯২ থেকে ২০০৪ এই ১৪ বছরে রপ্তানি-জিডিপির অনুপাতও বৃদ্ধি পেয়েছিল। একসময় জিডিপি ৯ শতাংশ হারেও বেড়েছে। শ্রীরঙ্কার মাথাপিছু আয়ও বাংলাদেশ থেকে বেশি ছিলো, প্রায় ৪ হাজার ডলার। কিন্তু কোন লাভ হয়নি এতে। একদিকে পুঁজিবাদী শোষণের অবশ্যম্ভাবী ফল দুর্নীতি ও লুটপাট, অন্যদিকে একটিমাত্র রপ্তানীখাতের উপর অতিনির্ভরতা ডলারের রিজার্ভ কমিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। একই পরিস্থিতি বাংলাদেশেরও। গার্মেন্টস ও প্রবাসী রেমিট্যান্সই বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান খাত। ফলে এক্ষেত্রে ধ্বস নামলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ধ্বস নামা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

তৃতীয়ত, এই প্রকল্প ও কেনাকাটা থেকে লুটপাটের ফলে অর্জিত অর্থ বিদেশে পাচার করা হয়েছে। দেশে শুধু প্রকল্পের অর্থ নয়, ব্যাংক থেকেও হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট হচ্ছে এবং বিদেশে পাচার হচ্ছে। এটা সম্ভব হয়েছে একটা অবৈধ সরকার এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকার কারণে। পলাতক পুঁজি (পধঢ়রঃধষ ভষরমযঃ) সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনাকারী সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই) জানাচ্ছে যে, এখন প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে ৭ থেকে ৯ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পুঁজি বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতিতে এই ধরনের নৈরাজ্য ও অর্থ পাচার শ্রীলঙ্কার পথে হাঁটার গতিকে ত্বরান্বিত করছে।

চতুর্থত, এ সমস্ত কিছু সহজে সম্ভব হয়েছে কারণ শ্রীলঙ্কার মতোই একদলীয় কর্তৃত্ববাদী শাসকরা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন। শ্রীলঙ্কার বৃহৎ পুঁজিপতিরা যেমন রাজাপক্ষেদের সমর্থন দিয়েছে, অপরদিকে ঠিক তেমনি রাজাপক্ষে সরকার তাদের রক্ষা করেছে, তাদের পুঁজি ও মুনাফা বেড়েছে। এর তথ্য আমরা পূর্বেই দিয়েছি। বাংলাদেশে বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠীর সমর্থনে আওয়ামী লীগ সরকার ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করেছে। রাষ্ট্রযন্ত্র পুরোপুরি এককেন্দ্রিক হওয়ার কারণে যে কোন গণবিরোধী সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সরকারকে কোন বেগ পেতে হয় না। একই পরিস্থিতি ছিলো শ্রীলঙ্কায়। শ্রীলঙ্কায় সাংবিধানিক কাউন্সিলের মাধ্যমে ক্ষমতার যতখানি ভারসাম্য তৈরি হয়েছিলো, ২০ তম সংশোধনীতে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে সেটি বিলুপ্ত করে দেন এবং প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করেন। কর্তৃত্ববাদী শাসন, গণতন্ত্রহীনতা ও ক্ষমতার যথেচ্ছা ব্যবহার শ্রীলঙ্কার এই পরিণতিতে একটা বড় ভূমিকা রেখেছে, যে চিত্র বাংলাদেশের সাথে অভিন্ন।

মিল আছে বলেই শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে আতঙ্ক ও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য সেটা একটা ইঙ্গিত যে, এই ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর পরিণতি কী হতে পারে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি মানেই নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা, সংকট, নৈরাজ্য। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী শাসন ও মেগা প্রকল্পভিত্তিক লুটপাট কত দ্রুত একটা দেশকে খাদের মধ্যে ফেলে দিতে পারে শ্রীলঙ্কা তার একটা দৃষ্টান্ত। আর খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা বাংলাদেশের জন্য একটা ইঙ্গিত।

অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য নয়

১ম পৃষ্ঠার পর

নিয়ে গড়ে না উঠায় আন্দোলনে যুক্ত দলসমূহের উপর তার লক্ষ্যণীয় প্রভাব দেখা যায়। বিরোধী প্রায় সকল দলের দাবি এক হওয়ায় জোটগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে জোটকে বিস্তৃত কিংবা পুনর্বিন্যাস করা কিংবা অপরাপর আন্দোলনরত জোটগুলোর সাথে যুগপৎ আন্দোলন করা যায় কিনা সেই প্রশ্ন আন্দোলনের সামনে আসে এবং সেটা আসাই স্বাভাবিক। সকলেরই আশু দাবি যেহেতু আওয়ামী লীগের পতন ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন– সেহেতু এই প্রশ্ন আসে যে, প্রশাসনিক দমন-পীড়ণ যখন এত তীব্র, তখন সকল আন্দোলনরত সকল শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত নয় কি? বিএনপি বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী দল এবং আওয়ামী লীগের সাথে তাদের নীতিগত প্রভেদ নেই। আবার বর্তমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে একইভাবে বিচার করা চলে না। আওয়ামী লীগ এক যুগের বেশি সময় ধরে ফ্যাসিবাদী শোষণ চালাচ্ছে, আর বিএনপি বিরোধী দল। তাদের নেতাকর্মীরা নির্যাতিত, নিপীড়িত। ফলে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে কোন রাজনৈতিক বক্তব্যের লক্ষ্যবস্তু থাকবে আওয়ামী লীগ। কারণ পুঁজিবাদী শোষণ পুঁজিপতি- ব্যবসায়ী শ্রেণি চালাচ্ছে রাষ্ট্রের মাধ্যমে। আর সেই রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ। ফলে গণতন্ত্রের কথা যখন বলা হয়, তখন এই মুহূর্তে গণতন্ত্রকে কারা হরণ করছে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে হয়। বিএনপি'র কথা উল্লেখ করা যায় গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে ভবিষ্যৎ সতর্কতা হিসেবে। অর্থাৎ যখন এই ফ্যাসিবাদী শাসনের সমাধানের প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে হাজির হয়, তখন বিএনপি যে সমাধান নয়, বরং সে এই গোষ্ঠীরই সহযোগী শক্তি– এই সত্য মানুষের সামনে স্পষ্ট করার প্রয়োজনে বিএনপি'র কথা আসে। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে প্রধান লক্ষ্য না করে কেবল দ্বিদলীয় বৃত্ত ভাঙার বক্তব্য দেয়া মানে সুনির্দিষ্ট যে দলের নেতৃত্বে চলমান দুঃশাসন চলছে তাকে আড়াল করা। আবার ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের মধ্যে লড়াইরত শক্তির মধ্যে কারা আপাত অর্থে গণতান্ত্রিক শক্তি, কারা ফ্যাসিবাদেরই আরেক অংশ–তা চিহ্নিত করা দরকার। লড়াইয়ের ময়দানে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করার কাজ বামপন্থী শক্তির। অন্যরা এই কাজ করবে না। কারণ তারা কোন না কোনভাবে ক্ষমতার অংশীদার হতে চায়। আগে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ হঠাও, পরে আলোচনা হবে–এই তাদের মূল বক্তব্য। এই কাজ করে বামপন্থীদের চলে না। কারণ সে জানে যে শুধু ক্ষমতার হাতবদল করে সমাধান আসবে না। জনগণ আরও গভীরতর সংকটে নিমজ্জিত হবে। ফলে আজ একে হটাও, কাল তাকে হটাও–এই হটানোর রাজনীতিতে মুক্তি আসবে না। কিন্তু এও ঠিক ফ্যাসিবাদকে পাকাপোক্ত করছে যে দল, যে দল দেশের প্রত্যেকটি স্তরে ফ্যাসিবাদী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে–তাকে হটালে রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্রগত কোন পরিবর্তন না হলেও কর্তৃত্বটা দুর্বল হয়, গণতান্ত্রিক আন্দোলন এই সময়ে একটু বিকাশের রাস্তা পায়। ফলে হটানোর স্লোগান বামপন্থী শক্তিকেও দিতে হয়, কিন্তু অবশ্যই কাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে সেটা উল্লেখ করে। এই সময়ে নিরপেক্ষ সরকারের দাবির সাথে সাথে আরও কিছু দাবি তোলা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইতিমধ্যেই শাসকশ্রেণি সংবিধানকে বারবার কাঁটাছেড়া করেছে। সংবিধানের ভূমিকা হওয়ার কথা ছিলো গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোর রক্ষাকবচ হিসেবে। অর্থাৎ কোন শাসকদল জনগণের ম্যান্ডেট পেলেও যা ইচ্ছা তাই যাতে না করতে পারে সেজন্য সংবিধান। কিন্তু এখন সংবিধান সংশোধন করে এর মাধ্যমেই সকল অন্যায়কে বৈধতা দেয়ার কাজ চলছে। ফলে অন্যান্য যেসকল দাবি বিভিন্ন সময়ে বাম গণতান্ত্রিক জোটসহ বিভিন্ন দল থেকেও তোলা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারেও জনমত সৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ। এরমধ্যে নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার করে সকল রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার দেয়া, নির্বাচনে অর্থ ও পেশীশক্তির ব্যবহার বন্ধ করা, নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ পর্যাপ্ত ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মক্ষম সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন, নির্বাচনে ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার ব্যবহার বন্ধ করা ইত্যাদি সংস্কার নির্বাচনী ব্যবস্থায় আনা দরকার। তা না হলে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হলেই সেটি সুষ্ঠু হবে না।

এই দাবিগুলো নিয়ে রাজপথে লড়াই গড়ে তোলা উচিত। আবার এটাও বলা দরকার, যত সুষ্ঠু নির্বাচনই হউক না কেন, তা দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনের কোন পরিবর্তন ঘটাবে না। নির্বাচন এই পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এরজন্য দরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন। এই মুনাফাভিত্তিক, শোষণমূলক, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের অবস্থার কোন পরিবর্তন আসবে না। এজন্য লড়াই তাদেরকে করতেই হবে। আপেক্ষিকভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়ে সরকার পরিবর্তনই হউক আর বিদ্যমান শাসন দীর্ঘস্থায়ীই হউক– লড়াই ছাড়া তাদের মুক্তি নেই। এই পরিবর্তনগুলো লড়াইয়ের উপর আক্রমণের তীব্রতার কিছুটা পরিবর্তন করতে পারে, লড়াইয়ের গতিকে তীব্র ও শ্লথ করতে পারে –এটুকুই। ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নির্বাচনসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে লড়াই চালাতে হবে, পাশাপাশি এই ব্যবস্থার শোষণের সবচেয়ে বেশি শিকার যে শ্রেণি, তাকে সুশিক্ষিত করে এই ব্যবস্থা ভেঙে নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত। এই শ্রেণির মুক্তির মধ্য দিয়েই সমস্ত রকম শোষণ ও পরাধীনতার অবসান ঘটবে।

জনগণকে সুরক্ষা

১ম পৃষ্ঠার পর

থাকলেন।

এই মানুষদের সুরক্ষা দেয়া তো দূরের কথা, করোনা পরবর্তীকালে দ্রব্যমূল্য উল্কাগতিতে বাড়তে থাকলো। চাল, ডাল, সয়াবিন তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়লো। কাটা ঘায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দিতে গ্যাস ও পানির দাম বাড়ানো হলো। বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করা হলো। সরকার নিজেই মূল্যস্ফীতি স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু যে তথ্য দিচ্ছেন সেটা প্রকৃত মূল্যস্ফীতির চেয়ে অনেক কম। সরকার বলছেন মূল্যস্ফীতি ৬.২২%, বাস্তবে মূল্যস্ফীতি খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও ১৫% এরও অধিক। ফলে দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য রেশন ও স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা এ সময়ে কত জরুরী তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু বাজেট সম্পর্কে এ পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে বা প্রাক বাজেট আলোচনা যতটুকু এসেছে তাতে এক্ষেত্রে সেরকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। সামাজিক সুরক্ষা খাতের বরাদ্দ তো বাড়ছেই না, উপরন্তু এ খাতের বেশিরভাগ অর্থই অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন খাতে ব্যয় হয়, খাদ্য নিরাপত্তা বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় হয় কম। অর্থাৎ সাধারণ জনগনের উপর নতুন করে অর্থনৈতিক সংকট ও মূল্যস্ফীতিসহ অন্যান্য চাপ বাড়লেও নতুন বাজেটে তার কোন ছাপ থাকবেনা। নতুন বাজেটে সেই পুরনো চিত্রই আমরা দেখবো– জনকল্যাণমূলক খাত, সামাজিক সুরক্ষামূলক খাতে বরাদ্দ কমানো আর ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা বৃদ্ধি। বাজেট প্রস্তাবনার পর ব্যবসায়ীদের প্রতিক্রিয়া অনুসারে তাদের স্বার্থে কিছুটা অদলবদল। অর্থাৎ সেই তথাকথিত জনগণের সরকারের তথাকথিত জনগণের বাজেট, কিন্তু ব্যবসায়ীদের স্বার্থে।

৮ম বর্ষ, ০৩ সংখ্যা, জুন ২০২২

শ্রীলংকা, বাংলাদেশ ও উন্নয়নের ফানুস

'দক্ষিণ এশিয়ার সিঙ্গাপুর' খ্যাত শ্রীলংকায় অর্থনৈতিক ধ্বস ও এর প্রতিক্রিয়ায় গণবিক্ষোভ সম্প্রতি বহুল আলোচিত। শ্রীলংকার অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের মিল-অমিল নিয়ে প্রচুর বিতর্ক চলছে। পাকিস্তানেও অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে সামরিক বাহিনী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেপথ্য হস্তক্ষেপে সংসদীয় পন্থায় ইমরান খান সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশে গত দুই মেয়াদে জনগণের ভোট ছাড়াই ক্ষমতাসীন স্বৈরতান্ত্রিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত আওয়ামী লীগ সরকার কিছুটা অস্বস্তিতে। গত এক যুগের 'উন্নয়ন'-এর সাফল্য যেভাবে প্রচার করা হয়েছে ও হচ্ছে, তা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। বিশেষ করে অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধিতে জনজীবন বিপর্যস্ত, ধনী-গরিবের আকাশচুম্বী বৈষম্য প্রকটভাবে দৃশ্যমান, কোভিড মহামারীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীব-মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক দুর্দশা, স্বাস্থ্যখাতের বেহাল দশা একেবারে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতি, বিপুল ঋণভার, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়া, রেমিট্যান্স হ্রাস, ডলার সংকট, চাকচিক্যপূর্ণ অপ্রয়োজনীয় মেগাপ্রকল্প, ব্যাংকখাতে খেলাপি ঋণ-অর্থ আত্মসাৎ, অর্থ পাচার, কালো টাকা, সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, এলডিসি উত্তরণের ফলে চ্যালেঞ্জ – এসব নিয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতিসংশ্লিষ্টরাও উদ্বিগ্ন।

শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ :
উন্নয়নের একই নীতি

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুনাফাভিত্তিক। সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনই এখানে উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য। ফলে এই ব্যবস্থায় বৈষম্য থাকবে, অর্থনীতিতে মন্দা আসবে এটাই স্বাভাবিক। তবে একটা দেশ যখন এ ধরনের সংকটে পড়ে যে তার রিজার্ভ তলানীতে, রিজার্ভ না থাকার কারণে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য বাইরে থেকে সে আমদানি করতে পারছে না, দেশে খাদ্য সংকট চলছে, জ্বালানী আমদানি করতে না পারার কারণে দিনে ১০ থেকে ১২ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকছে না, শিশুখাদ্য ও ওষুধের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে– তখন পুঁজিবাদী অর্থনীতির কোন নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে এই আপেক্ষিক ভারসাম্যও থাকলো না, সে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাতে বাংলাদেশের সাথে তুলনামূলক আলোচনা আসছে কেন?

এই তুলনামূলক আলোচনা আসার কারণ অনুসন্ধানের আগে আমরা শ্রীলঙ্কার এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের কী কী পদক্ষেপ ভূমিকা রেখেছে সেটা আলোচনা করি।

১. শ্রীলঙ্কা সরকার জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় খাতকে বাদ দিয়ে অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ করেছে। নেয়া হয়েছে রাস্তা, ফ্লাইওভার তৈরির বড় বড় অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প। আর এজন্য বিপুল পরিমাণ ঋণ নেয়া হয়েছে বন্ড ছেড়ে। যে ঋণ এখন পরিশোধ করতে হচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে আজ এইসকল অবকাঠামো তৈরিকেই উন্নয়ন বলে ধরা হয়। শ্রীলঙ্কাও বিশ্বায়নের সেই তথাকথিত উন্নয়নের ফাঁদে পা দিয়েছে।

২. এই বড় বড় প্রকল্পগুলোতে বিনিয়োগ করা অর্থের একটা বড় অংশ লুটপাট হয়। এই লুটপাটের মাধ্যমে ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিগোষ্ঠীর পুঁজি বাড়ে, আর জনগণের কাঁধে ঋণের বোঝা বাড়তেই থাকে। এই ধরনের প্রকল্প নিতে গেলে ও বাস্তবায়ন করতে গেলে কর্তৃত্ববাদী শাসন দরকার। শ্রীলঙ্কায় রাজাপক্ষে পরিবার প্রায় . . .বছর ধরে সে দেশের ক্ষমতায় আছে। তারা গোটা দেশের প্রশাসন ও অন্যান্য ক্ষেত্রের একচ্ছত্র অধিপতি। বর্তমান প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষের বড় ভাই এতদিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পরিবারের ৭ জন সদস্য মন্ত্রীত্বসহ অন্যান্য সরকারি পদ অলংকৃত করে ছিলেন। ফলে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। একইসাথে তারা নিজেরাসহ সরকারি পদে থাকা অন্যরা বেআইনি সম্পত্তির পাহাড় গড়ে তুলেছেন।

৩. কৃষিতে রপ্তানীনির্ভর ফসলের উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে যায়। নিজে কত পরিবেশবান্ধব এটা দেখাতে গিয়ে ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষে সকল প্রকার কেমিক্যাল সারের উপর সামগ্রিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই অপরিকল্পিত পদক্ষেপে দেশে কৃষি ফসল বিশেষ করে ধান ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে যায়। এই পরিস্থিতিতে অক্টোবরে তিনি এই নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন এবং রাসায়নিক সার আমদানির জন্য বেসরকারি মালিকদের ছাড়পত্র দেন। একইসাথে কৃষকদের সারের উপর দেয়া ভর্তুকি তুলে দেন। এই ধাক্কায় দেশের ৫ লক্ষেরও বেশি কৃষিজীবী মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যায়।

৪. কোভিডপরবর্তী সময়ে শ্রীলঙ্কায় সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দেয়া হয়নি কিন্তু পুঁজিপতিদের দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বিপুল পরিমাণ কর ছাড় দেয়া হয়েছে। পর্যটনখাতে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ৬০ শতাংশ কর ছাড় দেয়া হয়েছে। এই গোটা সময়ে তাদের গায়ে কোন আঁচড় লাগেনি। ২০২১ সালের এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে শ্রীলঙ্কার শীর্ষ ৯ জন ধনকুবেরের আয় হয়েছে ৩৬৪ বিলিয়ন শ্রীলঙ্কান রুপি। তাদের মুনাফা বেড়েছে ১৮৯ শতাংশ। অথচ শূন্য হয়েছে রাষ্ট্রীয় কোষাগার।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে আরও কিছু কারণ আছে। যেমন অবৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানো ও অন্যান্য। সেগুলো বিস্তারিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এসেছে। আমরা এই প্রধান কয়েকটি কারণ নিয়েই আলোচনা করবো।

কেন শ্রীলঙ্কার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশই বেশি আলোচিত

প্রথমত, বাংলাদেশে শ্রীলঙ্কার মতোই একের পর এক অপ্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের বড় বড় প্রকল্পগুলো নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলো নেয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ইকোনমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়নি। অর্থনীতিবিদ ড. মইনুল ইসলাম তাঁর একাধিক লেখা এবং আলোচনায় এরকম কিছু প্রকল্পের উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক ঋণ করেছে যে প্রকল্পে সেটি হলো রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এক লাখ তেরো হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে রাশিয়ার ঋণ নির্ভর এই প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য অপ্রয়োজনীয় ছিলো। অন্য উৎস থেকে এর চেয়ে কম ব্যয়ে সমপরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। ড. মইনুল আরো দুইটি প্রকল্পের কথা বলেছেন, যেগুলো অর্থনৈতিকভাবে অপ্রয়োজনীয় এবং আত্মঘাতী। এর মধ্যে আছে পদ্মা সেতু দিয়ে চীনের ঋণে চল্লিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে যশোর ও পায়রা বন্দর পর্যন্ত রেল লাইন টেনে নেয়া। তিনি দেখিয়েছেন স্থলপথের সাথে পাল্লা দিয়ে এই রেল লাইন প্রকল্প অর্থনৈতিকভাবে কোনোদিনই লাভবান প্রকল্প হিসেবে দাঁড়াবে না। এছাড়া চট্টগ্রাম থেকে দোহাজারি হয়ে ঘুমধুম পর্যন্ত রেল লাইন, যেটি চীনের কিউমিন পর্যন্ত যাবার একটা প্রকল্প ছিলো। কিন্তু সেটি থেকে ভারত বেরিয়ে যাওয়ায় তের হাজার কোটি টাকার ঋণ নির্ভর এই প্রকল্পও বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সাদা হাতি হবে বলে ড. মইনুল মনে করেন।

প্রকল্পগুলো জনগণের জীবনমান উন্নতির বিচারে অপরিকল্পিত হলেও, সরকার ও ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি ও লুটপাটের জন্য খুবই পরিকল্পিত। এ প্রসঙ্গে রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কথা আলোচনা করা যায়। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা না বাড়িয়ে বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলার জন্য ২০০৯ সালে ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন দেয়া হলো। এই বিদ্যুকেন্দ্রগুলো স্থাপন করলেন বড় বড় ব্যবসায়ীরা, এদের অনেকে এখন সরকারি দলের সাথে সরাসরি যুক্ত। সরকার তাদের সাথে চুক্তি করলেন যে, এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর যতটুকু সক্ষমতা তার বিপরীতে প্রতি মাসে তাদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাড়া দেয়া হবে। উৎপাদনক্ষমতার সমপরিমাণ বিদ্যুৎ যদি তাদের উৎপাদন করতে নাও হয় তবুও সেই ভাড়া মাসে মাসে দিতে হবে। রাতারাতি গজিয়ে উঠা এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা দেশের বিদ্যুতের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। আবার সক্ষমতার পরিপূরক জাতীয় গ্রিডে সংযুক্তির জন্য সঞ্চালন লাইনও সরকার তৈরি করেনি। ফলে কখনও প্রয়োজন হলে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে, কিন্তু জাতীয় গ্রিডে এই বিদ্যুৎকে সংযুক্ত করতে পারবে না। ফলে এই সক্ষমতা পুরোপুরি অকার্যকর। এই বাড়তি সক্ষমতার খরচ বহন করছে দেশের জনগণ। আর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো অলস হয়ে বসে থাকছে। গত অর্থবছরে, সরকার (বাস্তবে করদাতা জনগণ) ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা সক্ষমতার খরচ হিসেবে এসব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে দিতে বাধ্য হয়েছে, যা কর্ণফুলী টানেল প্রকল্পের খরচের চেয়ে বেশি। এর আগের বছর, এই পরিমাণটি ছিল ৮ হাজার কোটি টাকা যা পায়রা সমুদ্র বন্দরের মোট খরচের অর্ধেক। আরেকটি উদাহরণ দেয়া যায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সেরও উড়োজাহাজ নিয়ে। তাদের এক সময় গন্তব্যসংখ্যা বেশি ছিল, সে তুলনায় উড়োজাহাজ ছিল কম। কিন্তু এখন তাদের অনেকগুলো উড়োজাহাজ, কিন্তু সে তুলনায় গন্তব্যসংখ্যা কম। একটু সচেতন, শিক্ষিত মানুষ মাত্রেই প্রশ্ন আসবে, ৩০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করে নতুন দুটি ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ কেনার সময় কি কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলো ভালো করে ভেবে দেখেননি?

ভেবে না দেখার কিছু নেই। তারা ভেবেছেন। ভেবেছেন এখান থেকে তাদের লাভ কতো হতে পারে। যত বড় প্রজেক্ট, সেটা কনস্ট্রাকশনই হউক আর কেনাকাটাই হউক, তত বেশি কমিশন, তত বেশি লাভ। শীর্ষ ১০টি মেগা প্রজেক্টের তিনটি হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, রামপাল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র ও মহেশখালী-মাতারবাড়ী উন্নয়ন প্রকল্প। এ তিনটির উপযোগিতা নিয়েই প্রশ্ন আছে, তার উপর এই প্রকল্পগুলোর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে পরিবেশের উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব আছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পারমাণবিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের সক্ষমতার বাইরে, এটা পরিবেশের জন্য হুমকি। এ নিয়ে প্রচুর কথা এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন। রামপাল প্রকল্প সুন্দরবন ধ্বংস করবে। এটি নিয়ে সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু সরকার কোন কিছুই কানে তুলেনি। কারণ তাদের হিসেবগুলো অন্যরকম।

এই প্রকল্পগুলোর ফলাফল কী? এক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাবদ রাশিয়ার কাছে ঋণ ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা। সিপিডি এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেছে, ২০০২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত এই ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৪৪ শতাংশ। কিন্তু ২০১২ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে বেড়েছে প্রায় ৬৭ শতাংশ। অর্থাৎ গত এক দশকে দেনার পরিমাণ এর আগের দশক থেকে দেড়গুণ বেড়েছে।

সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে লুটপাট ও দুর্নীতি। এই ঋণবৃদ্ধির হার অতি ধনী বৃদ্ধির হারের সাথে সমানুপাতিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা 'ওয়েলথ এক্স'-এর প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ২০১২ থেকে ২০১৭ এই পাঁচ বছরে অতিধনীর সংখ্যাবৃদ্ধির বিচারে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম। ওই পাঁচ বছরে বাংলাদেশে ৩০ মিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদের মালিক অতিধনীর সংখ্যা বেড়েছে বার্ষিক ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ হারে, যা বিশ্বের ২য় পাতায়

গোর্কির ‘মা’

গত ১৮ জুন ছিল বিশ্ববিখ্যাত রুশ কথাসাহিত্যিক ও মার্কসবাদী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ম্যাক্সিম গোর্কির ৮৬তম মৃত্যুবার্ষিকী। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ও কালজয়ী উপন্যাস ছিল ‘মা’। গোর্কির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই নিবন্ধ।

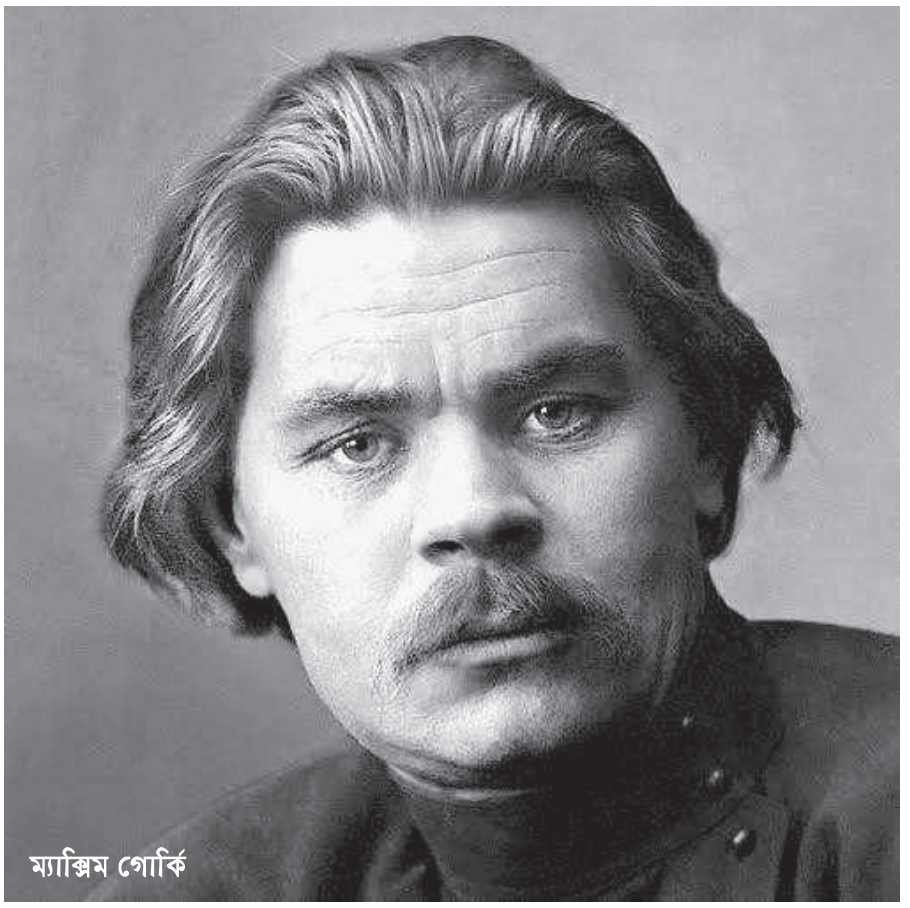
ম্যাক্সিম গোর্কি

পৃথিবীর সর্বাধিক ভাষায় অনূদিত, সর্বাধিক পঠিত ও বিক্রিত উপন্যাসের নাম ‘মা’। পৃথিবীব্যাপী প্রভাব বিস্তারকারী এই উপন্যাস কোটি কোটি মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। যে পটভূমিতে ‘মা’ উপন্যাসটি রচিত হয় সেই পরিস্থিতির ঘূর্ণাবর্তে গোর্কি নিজেও ছিলেন। ১৯০৬ সালে জার সরকারের গ্রেফতারি পরওয়ানার কারণে তিনি প্রথমে রাশিয়া ছেড়ে ফিনল্যাণ্ডে যান। পরে সুইজারল্যাণ্ড হয়ে আমেরিকায়। সেখানেই রচিত হয় অবিস্মরণীয় ‘মা’ উপন্যাসটি। দুনিয়া কাঁপানো নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বেকার উত্তাল রাশিয়ার জনজীবন হচ্ছে এই উপন্যাসের পটভূমি।

জার শাসিত রাশিয়ায় সাধারণ মানুষের কোনো অধিকার ছিল না। ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথার বিলুপ্তি কৃষককে জমিদারের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে পারেনি, তারা রয়ে গেল জমিদারের আজ্ঞাবহ। তাদের বেগার খাটতে হতো, জমিদার ইচ্ছেমত খাজনা নিতো। ফলে কাজের সন্ধানে অধিকাংশ কৃষক শহরে চলে এসে দুঃসহ বেকারত্ব বা স্বল্পমজুরিতে কাজ নেয়। কাজ নিয়ে মানুষে মানুষে চলে হানাহানি। এই সময়ে জাপানের সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ ও যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ঘটে ব্যাপক অর্থনৈতিক বিপর্যয়। শহরগুলোতে শুরু হয় ধর্মঘট। এক পর্যায়ে ১৯০৫ সালের ৯ জানুয়রি দেড় লক্ষ শ্রমিকের এক বিশাল সমাবেশ শীত প্রাসাদ অভিমুখে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা নিয়ে এগোলে জারের প্রাসাদ থেকে সেই মিছিলে গুলিবর্ষণ হয়। নিহত হয় এক হাজারেরও বেশি শ্রমিক। এই দিন রাশিয়ার ইতিহাসে ‘রক্তাক্ত রোববার’ হিসেবে পরিচিত। শহরে শ্রমিকরা রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে তিনদিন ধরে সশস্ত্র লড়াই করে। একই সাথে দেশজুড়ে ধর্মঘটের বন্যা বয়ে চলে। এই উত্তাল জনবিদ্রোহ গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। জমিদারের প্রাসাদ পুড়িয়ে দেয়া, শস্য লুট করে ক্ষুধার্ত কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া, জমি দখল ইত্যাদি চলতে থাকে। জুন মাসে কৃষ্ণ সাগরে অবস্থানরত নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ‘পটেমকি-ন’-এর নাবিকরা বিদ্রোহ করে।

শেষপর্যন্ত নেতৃত্বের অভাব, সমন্বয়হীনতা ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী স্তালিপিন প্রচণ্ড দমননীতি গ্রহণ করে এ সর্বাত্মক বিদ্রোহ দমন করে। বিদ্রোহীদের ফাঁসি দেয়, কারারুদ্ধ করে। এ পটভূমিতে ১৯০৬ সালে লেখা হয় ‘মা’ উপন্যাস।

‘মা’ উপন্যাসে আমরা দেখি একটা সাধারণ শ্রমিক পরিবারের, সর্বক্ষণ স্বামী কর্তৃক নির্যাতিতা, রাত্রিদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে ক্লান্ত শ্রান্ত ও ‘ভয় দিয়ে গড়া’ একজন নারীকে। এই নারী একসময় ছেলে পাভেলের বিপ্লবী পরিবর্তনে সাথী হতে গিয়ে নিজেও আমূল বদলে গেলেন। এ রূপান্তর কোনো একক মায়ের নয়, এটি গোটা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের অনিবার্য পরিবর্তনের প্রেরণাদায়ী চরিত্র হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। বিপ্লবী গোপন যোগাযে-াগের মাধ্যমে পাভেল যেভাবে চিন্তাশীল দায়িত্বশীল, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও উদ্দেশ্যমূখীন হয়ে উঠে, মা-ও অনেক তর্ক-আলোচনা, গ্রহণ-বর্জনের পথে ‘বিপ্লবী মা’ হয়ে উঠেন। মা খেয়াল করেন, ‘ছেলের মুখখানা দিনে দিনে ধারালো হয়ে উঠছে, চোখ দুটির গাম্ভীর্য বাড়ছে, আর ঠোঁট দুটি যেন একটি কঠিন রেখায় অশ্চর্য সংবদ্ধ’। ফলে মা হয়ে উঠেন তার সহযোগী।

মা দিনের পর দিন অনবরত স্বামীর মার খেয়েছেন। তবু এসব কথা বলতে গিয়ে মনে কোনো রাগ-দুঃখ নেই মায়ের। শুধু ঠোটের কোণে অনুতাপের হাসি। এই ঘটনা কোনো কিছু ব্যক্তিগত অপমানে না নিয়ে সমস্যাগুলো সামাজিক ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে নেয়ার শিক্ষা তুলে ধরে।

আলাপ-আলোচনা আর কাজ করতে করতে মা একসময় জীবনের সত্য, সমাজের সত্য বুঝতে পারেন। তিনি দেখতে পান, মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখা হয়েছে, লাভের জন্য সর্বস্ব শুষে নেয়া হচ্ছে। মা দেখেন, দুনিয়ার অজস্র ধন-সম্পদ, তবু মানুষ সর্বত্র অভাব-অনটনে দিন কাটায়। শহরে গীর্জাগুলো সোনা-রূপায় ভর্তি অথচ ভগবানের এসব কোনো দরকার নেই। দরকার গীর্জার সম্মুখে হাত পেতে দাঁড়ানো ঐ অসহায় ভিখিরির দলের। তখন তার রীবিনের কথা মনে পড়ে– ‘দেবতার নামেও ব্যাটারা আমাদের ঠকিয়েছে’।

আবার নিকোলাই মায়ের সামনে সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আরেকটা সত্য উম্মোচিত করে। বলে, “জুলুম করার এ লোভ ওদের ব্যাধি। সমস্ত মানুষের চরিত্র নষ্ট করে দিচ্ছে। এ পশুসূলভ সমাজব্যবস্থায় বাধ্য হয়ে আপনা থেকে মানুষকে জানোয়ার হতে হয়।”

বিপ্লবীদের জীবনে জ্ঞানচর্চা এত গুরুত্ববহ কেনো? বই পড়ায় মশগুল দেখে মায়ের প্রশ্নের উত্তরে পাভেল বলছে, “সত্য জানতে চাই বলে পড়ি। প্রথমে নিজে জানবো, তারপর অন্যদের জানাবো। শত বছর ধরে শ্রমিকদের শাসকগোষ্ঠী যেভাবে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখতে চেয়েছে, আজও অন্য সব দেশের মত আমাদের দেশেও শাসকগোষ্ঠী শ্রমিক-কৃষক-গরীব জনসাধারণকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে চায়। কারণ এটাই শাসকগোষ্ঠীর শক্তি।” তাই উপন্যাসের আরেকটা চরিত্র বলে,“আমাদের সবকিছু জানা দরকার। আমাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালালে তবেই তো যারা আঁধারে আছে তারা আমাদের দেখবে।”

পাভেল বলছে, “শুধু একপেট খেতে পাওয়াটাই আমাদের সব নয়। যারা আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে, আমাদের চোখে ঠুলি এটে রেখেছে, এদের দেখাতে হবে আমরা সব দেখতে পাচ্ছি।.... জ্ঞানের মাপকাঠিতে তাদের সমান হতে বাধা নেই, এমনকি তাদের থেকে বড় হতেও....।”

শ্রমিকদের মধ্যে আত্মমর্যাবোধ জাগিয়ে তোলা, আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে গোর্কির এ বক্তব্য এখনও প্রাসঙ্গিক। অথচ আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ, এটি শ্রমিকদের সেই পুরোনো ‘এক পেট খেতে পারা’ জীবনে আটকে রাখে।

রাজনীতি সচেতন, ইতিহাস সচেতন আর বিপ্লবী ধারার কর্মকাণ্ডের দিকে গোর্কি তাঁর অবস্থান নির্দেশ করে গেছেন।

সমাজতন্ত্র এমন এক আদর্শবোধ যা শ্রমিক শ্রেণিকে আন্তর্জাতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। পাভেলের বন্ধু খখল যখন মা কে বলে, “আমরা সবাই এক মায়ের ছেলে। সেই মা হলো এক দুর্নিবার ভাবনা, সারা দুনিয়ার শ্রমিক ভাই ভাই। এই আমাদের অক্ষয় মন্ত্র। এই মন্ত্র আমাদের বুকের বল, প্রাণের আগুন।। ন্যায়ের আকাশে এই সূর্যই জ্বলছে ঝলমল করে।...সমাজতন্ত্রী হলে সে নিজেকে যাই বলুক না কেন সে আমাদের ভাই। এক ভাবনায় বাঁধা সত্যিকারের ভাই। কালকের, আজকের, চিরকালের ভাই।” এই বক্তব্য শুধু মায়ের দৃষ্টিসীমা প্রসারিত করে তোলে না, পাঠক মনেও আন্তর্জাতিকতাবোধের এক নতুন জগৎ নির্মাণ করে।

বিপ্লবীদের জীবনেও নর-নারীর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার আকর্ষণ তৈরি হয়। কিন্তু একজন বিপ্লবী একে কিভাবে নেবে? পাভেলের কথায় আছে এর উত্তর। পাভেল খখল এর কাতরভাব লক্ষ করে বলে,“প্রেম-ভালোবাসা জীবনের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া চাই। যে ভালোবাসা পায়ে শিকল বেঁধে পিছন দিকে টানবে, অমন ভালোবাসা আমি চাই না।” নিজেকে বিশ্লেষণ করে মা বুঝতে পারেন জনগণের প্রতি গভীর ভালোবাসাই একমাত্র খাঁটি ভালোবাসা। মা বোঝেন,“আমরা শুধু ভালোবাসি নিজেদের যতটুকু দরকার, তার উপরে যেতে পারিনে।...যে সব ছেলে জেলে পঁচছে, সাইবেরিয়ায় যাচ্ছে, কেন? না, দুনিয়ার মানুষের জন্য....জান দিচ্ছে সব। কচিকচি মেয়েগুলো হিমের রাত্তিরে জল-কাদা-বরফ ভেঙে ক্রোশের পর ক্রোশ একলা হেঁটে শহর থেকে এখানে আসছে, কেন? কেন এত কষ্ট সয় ওরা? কে এসব করায় ওদের? না ওদের বুকের ভেতর আছে খাঁটি ভালোবাসা।”

অনেকে বিপ্লবী জীবনে অর্থসংস্থানের প্রশ্নে দ্বিধান্বিত থাকে। অথচ সেই সময় ‘মা’ উপন্যাসের আরেক চরিত্র খখল বলছে,“কিভাবে চলছি জানেন? চলছি অন্য লোকের টাকায়। নিকোলাই পচাত্তর রুবল পায় মাসে। তা থেকে পঞ্চাশ রুবল দেয়। অন্যরা তাই করে। কত সময় ছাত্ররা আধ পেটা খেয়েও এক এক কোপেক জমিয়ে আমাদের হাতে তুলে দেয়। তা ভদ্দরলোক নানা রকম আছে। কেউ তোমাদের দিকে ফিরে চাইবে না, কেউ ঠকাবে, কিন্তু যারা সেরা তারা আমাদের দলে ভিড়ে যাবে।’

পারিবারিক জীবন বিপ্লবীদের উদ্যোগকে ক্ষুন্ন করে। অভাব অনটন ছেলে পুলে নিয়ে তারা কী খাবে সেই চিন্তা তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে। সমস্ত কর্মশক্তি এতে বরবাদ হয়ে যায়। অথচ বিপ্লবীদের শক্তি বাড়ানো দরকার। আরো গভীর, আরো বিস্তৃতভাবে। এটা যুগেরই দাবি। ‘সবার চেয়ে আগে আগে আমাদের চলতে হবে, কারণ আমরা শ্রমিক। পুরনো পৃথিবীটাকে ভেঙ্গে নতুন পৃথিবী পত্তন করার কাজে ইতিহাসের ডাক এসেছে আমাদের কাছে।...আদর্শের হানি না ঘটিয়ে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারি এমন সঙ্গিনী তো নেই।’ আবার পারিবারিক আবেগ সম্পর্কে একজন বিপ্লবীর সংগ্রামের যথার্থ রূপ সম্পর্কে আমরা ধারণা পাই যখন খখল পাভেল সম্পর্কে বলে,“জেনেশুনেই সে গেছে। অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার ছেলে সে নয়।..... ও মানুষই আলাদা। জেনেশুনেই গেছে, তাকে হয় বেয়নেটের খোঁচা দেবে। নয় ঠেলে দেবে সাইবেরিয়ায়। তবু এগিয়ে গেল। ওর মা পথ আগলে শুয়ে থাকলেও ডিঙ্গিয়ে চলে যেত ও।”

সাশা যখন সিজভকে বলে,“আমার বাবার চাইতে আমার কাছে ন্যায় বড়।” তখন একই সুর বেজে উঠে। বিপ্লবী সংগ্রামে যুক্ত থেকে এ ধরণের উচ্চ ন্যায়নীতি অর্জন করা যায়।

‘মা’ উপন্যাস পাঠকমনে বিশ্বাসযোগ্যভাবে একটা স্বপ্ন বুনে দিয়ে যায়, ভবিষ্যতের সে স্বপ্নের কথা বলে এ লেখার ইতি টানছি।

‘আমি জানি, সময় আসবে যখন প্রতিটি মানুষ আর সকলের কাছে তারার মত হয়ে উঠবে। তাদের রূপে তারা নিজেরা মুগ্ধ হবে। পৃথিবীর বুকে থাকবে শুধু মুক্ত মানুষ। মুক্তি তাদের মহিমা দিয়েছে। প্রত্যেকটি হৃদয় খুলে যাবে। কারো মনে হিংসা-দ্বেষ থাকবে না। জীবন রূপ পাবে মানুষের সেবায়। মানুষের মূর্তি পাবে স্বর্গের দেউল। কিছুই মানুষের আয়ত্তের বাইরে নয়। মানুষ সেদিন সুন্দর হবে। সত্য আর সুন্দরের মুক্তিতে পাবে সে তার বীজমন্ত্র। আর সে মানুষ সারা পৃথিবীকে কোল দিতে পারবে। তাকে সবচেয়ে ভালোবাসবে, সর্ববন্ধন মুক্ত সে মানুষ হবে নরোত্তম, কারণ সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য সে মুক্তিতে। এ নবজীবনের মানুষই রচনা করবে মহাজাতি।’

ঐতিহাসিক ‘চা শ্রমিক দিবস’ পালিত

‘মুল্লুকে চলো’ আন্দোলনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে

যথাযোগ্য মর্যাদায় রক্তস্নাত ২০ মে ‘মুল্লুক চল আন্দোলন’ এর ১০১ তম বার্ষিকী নানা আয়োজনে পালিত হয়েছে। সিলেট, মৌলভী-বাজার, হবিগঞ্জ এর প্রত্যেক চা বাগানে সকাল ৮ টায় অস্থায়ী শহীদ বেদী নির্মাণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এছাড়া এই হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল যে চাঁদপুর জেলায় সেখানেও বড় স্টেশন (পুরনো স্টীমার ঘাট) অস্থায়ী শহীদ বেদী নির্মাণ করে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সিলেটের লাক্কাতুরা, মালনীছড়া, দলদলি, কেওয়াছড়া, হিলুয়াছড়া, ছড়াগাঙ, খান চা বাগান সহ প্রত্যেক চা বাগানে সকাল ৮ টায় অস্থায়ী শহীদ বেদী নির্মাণ করে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। বিকাল ৩ টায় নগর ভবন পয়েন্ট থেকে চা শ্রমিকদের ভূমি অধিকার, দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা সহ ১০ দফা দাবিতে একটি সুসজ্জিত র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ এর সাহিত্য আসর কক্ষে বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিটে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড জহিরুল ইসলাম, সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এমাদ উল্লাহ শহীদুল ইসলাম শাহীন এডভোকেট, চা শ্রমিক ফেডারেশন এর উপদেষ্টা কমরেড উজ্জ্বল রায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক সজল ছত্রী, শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন এর সিলেট জেলা আহ্বায়ক মোখলেছুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লাক্কাতুরা চা বাগান এর হৃদয় লোহার,বন্যা বাহাদুর,ছড়াগাঙ্গ চা বাগান এর খোকন ছত্রী,খান চা বাগান এর গীতা ওরাং,মালনীছড়া চা বাগান এর নমিতা রায়, হিলুয়াছড়া চা বাগান এর রবি মাল,কেওয়াছড়া চা বাগান এর সঞ্জীব, দলদলি চা বাগান এর হরি দাস প্রমুখ।

জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন খাতের ৪০ ভাগ কৃষিখাতে বরাদ্দের দাবিতে

জেলায় জেলায় কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের স্মারকলিপি পেশ

আমাদের দেশে কৃষককে উচ্চমূল্যে কৃষি উপকরণ কিনতে হয়। আর ধানসহ কৃষি ফসল বিক্রি করতে হয় লোকসানী দামে। ব্যাংক ঋণের অতিরিক্ত সুদ, মহাজনী ও এনজিও ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে আছে এ দেশের কৃষকরা। তারপরও কৃষক উৎপাদন করে, ফসল ফলায়। কৃষি ফসলের লাভজনক মূল্য না পেয়ে লোকসান গুণে, দেনার দায়ে সম্পদ-সম্পত্তি বিক্রি করে। এভাবে মধ্য কৃষক দরিদ্র কৃষকে, আর দরিদ্র কৃষক ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। এই চক্রই চলে আসছে বাংলাদেশের কৃষিতে।

এই প্রক্রিয়ায় এখন গতি পাচ্ছে কারণ প্রায় প্রতি বছর অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে, পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে যাচ্ছে হাওড় এলাকার ফসল, আগাম বন্যার ফলে কৃষক ও গ্রাম শহরের দরিদ্র মানুষ সর্বশান্ত হচ্ছে। কোটি কোটি ক্ষেতমজুরদের সারা বছর নিশ্চিত কাজ না নেই। বাজারে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। এই ক্ষেতমজুরদের টিকে থাকাই এখন প্রধান সংগ্রাম। স্বাস্থ্য-শিক্ষা বিলাসিতার বা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না।

এইসময়ে ক্ষেতমজুরদের

রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও সারা বছরের কাজ দিতে হবে। কৃষি ফসলের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করতে হবে, কৃষক ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র চাষীদের স্বল্প মূল্যে (আর্মি বা পুলিশ রেটে) গ্রামীণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সার, বীজ ও কীটনাশকসহ সকল কৃষি উপকরণের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে বিএডিসিকে কার্যকর করতে হবে। সকল কৃষি ঋণ মওকুফ করতে হবে, কৃষকদের উপর দেয়া সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। ঋণ নয়, কৃষিতে নগদ প্রণোদনা দিতে হবে। খাস জমি উদ্ধার করে প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। নদী ভাঙ্গন ও বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে। নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করতে হবে। ইকোনোমিক জোন (অর্থনৈতিক অঞ্চল) এর নামে এবং পাওয়ার প্লান্ট ও ইট ভাটা নির্মাণের নামে কৃষি জমি ধ্বংস, ভূমিহীনদের উচ্ছেদের বন্ধ করতে হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অতি বৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা, পাহাড়ি ঢল, আগাম বন্যায় তলিয়ে যাওয়া কৃষি ফসল হারানো ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও দরিদ্র মানুষদের দ্রুত সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

এগুলোসহ মোট সাত দফা দাবিতে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন মাসব্যাপী প্রচার, পথসভা, খুলি বৈঠক, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করে। গত ১ জুন সংগঠনের উপজেলা শাখার উদ্যোগে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে ও জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

সর্বজনীন রেশন

১ম পৃষ্ঠার পর

পারছেনা, তাদের রেশন দরকার, সামাজিক সুরক্ষা দরকার–এই কথাই বক্তারা বলছেন না। তারা দেখাচ্ছেন কেন এমন হয়, কী তার কারণ, কোন সে সমাজব্যবস্থা যার কারণে এমন ঘটে। তারা সাথে সাথে এও দেখাচ্ছেন এই ব্যবস্থা মানুষকে শুধু অর্থনৈতিকভাবে নিঃশেষ করে দিচ্ছেনা, তাকে নৈতিক দিক থেকেও পঙ্গু করে ফেলছে। ফলে এতো অন্যায়ের বিরুদ্ধেও গড়ে উঠছেনা কোন শক্তিশালী আন্দোলন। আন্দোলনের নেতারা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। লেখক-সাংবাদিক-সাহিত্যিকরা বিক্রি হয়ে যাচ্ছেন।

মানুষকে এ বক্তব্য টেনেছে, কারণ মানুষ এরকম একটা কিছুই শুনতে চাইছিলেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে যুক্তি ও নৈতিকতার সুরে বর্তমানের সংকটকে ব্যাখ্যা করলে তা মানুষকে টানবেই। ফলে দেখা গেছে সমাবেশ শেষ হলেও মানুষ যাচ্ছেন না। নেতাকর্মীদের চা খাওয়াচ্ছেন, প্রবল গরমের দিনে সমাবেশ, ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে ছুটে আসছেন কেউ কেউ। অথচ নিজেদের জন্য হয়তো এসব কেনার কথা চিন্তাও করতেন না।

সারাদেশে প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম কমছে না। বাড়ানো হচ্ছে না টিসিবির ট্রাকসেল, পণ্যের আওতা। এরমধ্যে টিসিবির বিক্রি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। বাস্তবে টিসিবিও পর্যাপ্ত নয়। আমরা দলের পক্ষ থেকে দাবি করেছিলাম যে, সর্বজনীন রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং খাদ্যপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালুকরতে হবে। কোন ব্যক্তিমালিক খাদ্যপণ্যের ব্যবসা করতে পারবে না।

বাস্তবে এ ধরনের কোন উদ্যোগ সরকারের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে না। ৫টি বড় শিল্পগোষ্ঠী সয়াবিন তেলের পুরো বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। একইভাবে চালের বাম্পার ফলন হওয়ার পরেও চালের দাম বেড়েছে। কারণ মিলাররা চাল মজুদ করেছেন। আবার চালের বাজারে এখন প্রাণ আরএফএল সহ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ঢুকেছে। ফলে চালের দাম বাড়ছে। এরই মধ্যে রুটি, বিস্কুটসহ সকল ধরনের বেকারিপণ্যের দাম বেড়েছে। শ্রমজীবী মানুষেরা সারাদিনের কাজের ফাঁকে যে সকল খাদ্য খান, সবকিছুরই দাম বেড়েছে। ফলে তাদের ব্যয় বেড়েছে, কিন্তু আয় বাড়েনি। এর পরোক্ষ প্রভাব সামনে আসছে না। হাতে টাকা না থাকায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় তারা টাকা খরচ করতে পারছেন না। চিকিৎসা করাতে পারছেন না। এ এক মানবেতর জীবন, আজ যা দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রতিদিনের জীবন। লড়াই ছাড়া এ অবস্থার পরিবর্তন হবে না। ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া এ জীবনেরও কোন পরিবর্তন আসবে না। শুধু খাবারের জন্য নয়, শ্রমজীবীদের লড়াই তো কোনরকমে বাঁচার জন্য নয়, মর্যাদার সাথে বাঁচার জন্য। সে লড়াইয়ের ডাক নিয়েই এই দলের নেতাকর্মীরা ছুটছেন।

৮ম বর্ষ, ০৩ সংখ্যা, জুন ২০২২

সাম্যবাদ

স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভমূলক আন্দোলন নয়

সংগঠিত, সচেতন, দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনই বর্তমানে প্রয়োজন

কমরেড শিবদাস ঘোষ

"...আমরা যে বিপ্লবের কথা বলি, যে যুদ্ধ আমরা গড়ে তুলতে চাইছি, তা হচ্ছে শ্রেণিযুদ্ধ অর্থাৎ জনযুদ্ধ। সমস্ত জনতার একটা বিরাট অংশকে সংগঠিত করে বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনায় ও বিপ্লবের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই একমাত্র সেই 'প্রেট্রাকটেড' বা দির্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ সম্ভব। হঠাৎ কোন একটা বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে মানুষের যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, যে আন্দোলনের মধ্যে বিপ্লবী মতাদর্শের বা বিপ্লবী তত্ত্বের কোন 'কনভিকশন' (ভিত্তি) নেই, সেই ধরনের 'স্পোরাডিক' বা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন থেকে এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ কখনোই জন্ম নিতে পারে না।

মানুষের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে দেশের অভ্যন্তরে যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনগুলো গড়ে ওঠেছে সেই আন্দোলনগুলোকে নেতৃত্ব দিতে দিতে তার মাধ্যমে জনতাকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে যদি আমরা জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ারগুলো একদিন গড়ে তুলতে পারি তবেই একমাত্র এ জিনিস সম্ভব। অথচ, আমাদের দেশের আন্দোলনগুলোর চরিত্র কি সেইরকম? এখানে কী ধরনের আন্দোলন হচ্ছে? যেমন, খাদ্যের দাবিতে দেশের অভ্যন্তরে একটা আন্দোলন এসে গলে, লড়াই এসে গলে, তাতে হাজার-তাজার লোক সামিল হ'ল, লড়ালড়ি হ'ল, তারপর সেই লোকগুলো আবার হারিয়ে গেল। কেন হারিয়ে গেল? কারণ, যে হাজার হাজার মানুষ এই আন্দোলনের মধ্যে এসে গলে সেই মানুষগুলো বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আসেনি–বিপ্লব করবার জন্য, বিপ্লবী পার্টি গড়ার জন্য প্রতিদিন সংগ্রাম করার মতন ধৈর্য, চেতনা, ডেডিকেশন, মানসিকতা তাদের মধ্যে গড়ি ওঠেনি। অথচ এ কথাও সত্য যে, তারা হাজারে হাজারে ঝাঁকে ঝাঁকে সেই লড়াইয়ের ময়দানে এসেছিল। একটা ইস্যুর ওপর ভিত্তি করে আন্দোলনের যে আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল, সেই আবহাওয়ায় তারা এসে জড়ো হয়েছিল। এই ধরনের হাজার হাজার মানুষের আন্দোলন প্রতিদিন দেশে গড়ে ওঠে না। মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ জমতে জমতে একদিন যে-কোনো একটা ইস্যুকে ভিত্তি করে, নেতৃত্ব থাক আর না থাক, সেটা ফেটে পড়ে। এই ফেটে পড়া স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনটার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা না থাকার ফলে, জনগণের বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতৃত্ব তার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে না পারার ফলে, কয়েকদিনের মধ্যেই তা স্তিমিত হয়ে যায়, হারিয়ে যায়। ফলে আবার চলে একটা ফ্রাস্ট্রেশনের পিরিয়ড। আবার মানুষগুলো মার খেতে থাকে আর ধুঁকতে থাকে। এইভাবে মার খেতে খেতে আবার একটা সময় ঐরকম স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে তারা ফেটে পড়ে।

আমাদের দেশের নানান আন্দোলন আজ পর্যন্ত যা হছৈে–একটি-দুটি-চার-টি ঘটনা ছাড়া বেশিরভাবগ ক্ষেত্রেই আন্দালনগুলোর চরিত্র হচ্ছে এই ধরনের। স্বভাবিক অবস্থায় মার খেতে খেতে ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গিয়ে বানের জোয়ারের মতন একটা 'আপহিভল' অভ্যুত্থান হ'ল, যার মধ্যে বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনা বা যার ওপর বিপ্লবী নেতৃত্বের আদর্শগত প্রতিষ্ঠা–এসব কিছুই নেই। ফলে আমরা, যেসব পার্টি ওপর থেকে একটা কমিটি করে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিই তারা আন্দোলনের মধ্যে হাজার হাজার লোক কোথা থেকে এল এবং তারপর কোথায় হারিয়ে গেল তার খবরই রাখি না। যারা ঐক্যবদ্ধভাবে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলে ওপর থেকে এই আন্দোনগুলোতে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব দিয়ে আসছে সেই সমস্ত পার্টির কাছে আমরা বারবার বলেছি যে, ওপর থেকে একটা আন্দোলনের ডাক দিয়ে নেতারা জেলে গিয়ে বসে থাকেন, সেনাপতিদের মতন তারা কাজটা করেন না। তাদের উচিত এই আন্দোলনের ডাক দেওয়ার সাথে সাথে যে মানুষগুলো আন্দোলনে আসতে চাইছে বিভিন্ন গণকমিটিতে তাদের যুক্ত করে সেই গণকমিটিগুলিকে নেতৃত্বকারী কমিটিতে রূপান্তরিত করা এবং তাদের মাধ্যমেই আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করা, অন্যদিকে আন্দোলন চালাতে চালাতেই বিভিন্ন দলের মধ্যে পরস্পর রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংগ্রাম চালানো। এই মতদর্শগত সংঘর্ষ ছাড়া জনগণের রাজনৈতিক চেতনা পরিষ্কার হতে পারে না। কারণ, যে দলগুলি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসে আন্দোলন সম্পর্কে তাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি এক থাকে না। একেকটা পার্টি 'এজিটেশন'কে (বিক্ষোভ) সামনে রেখে একটু 'বাংগলিং' করে। আন্দেলনের মধ্যে জনসাধারণ মরে, লাঠি খায়, গুলি খায়–আর তারা তার বিরুদ্ধে প্রচার-টেপ্রাপাগান্ডা চালাতে থাকে। তারপর নির্বাচন এলে তাকেই পুঁজি করে জিতে গিয়ে মালাটালা পরে রাজা-উজির-মন্ত্রী হয়ে বসে। ব্যস। এই হচ্ছে বেশিরভাগ দলেরই আন্দোলন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি। ...

... অন্যদিকে সত্যিকারের একটা বিপ্লবী দল চায়, এই যে এজিটেশনাল মুভমেন্ট, এর মধ্য দিয়ে যেন অন্তত জনগণের খানিকটা রাজনৈতিক চেতনা, খানিকটা জনগণের বিপ্লবী নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং জনগণের ক্ষমতা গড়ে তোলবার হাতিয়ার গণকমিটিগুলি রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে গড়ে উঠতে পারে। এই গণকমিটিগুলি স্থায়ী কমিটি হবে না। এগুলি প্রতিটি আন্দোলনে খানিকটা চেতনা নিয়ে গড়ে উঠবে, আবার আন্দোলনের পর ভেঙে যাবে। এইরকম প্রত্যেকটা আন্দোলনে যদি এই গণকমিটিগুলি খানিকটা খানিকটা রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে তাহলে জনগণ নিজেরাই আন্দোলন পরিচালনা করতে শিখবে এবং আন্দোলনে নেতৃত্ব গড়ে তুলতে শিখবে। জনগণ যখন লড়াইয়ের মধ্যে থাকে তখন তার মধ্যে 'উইস্ডম'টা (প্রজ্ঞা) না থাকতে পারে, কিন্তু লড়াইয়ে 'ফারভার'টা (উত্তাপ) খুব সুন্দর থাকে, লড়াইয়ের মনটা খুব পরিষ্কার থাকে। নেতাদের মধেথ্য সহজে যে 'ভাইসেস'গুলো দোষ) ঢোকে, পার্টির মধ্যে যেগুলো ঢোকে জনসাধারণের মধ্যে সেইটা থাকে না। লড়াইয়ের এই ফারভারের সাথে যদি জনগণের রাজনৈতিক চেতনা এবং উইস্ডমটা গড়ে ওঠে তাহলে জনসাধারণ নিজেরাই বুঝতে পারবে, কখন আন্দোন কতদূর নিয়ে যাওয়া চলতে পারে এবং কীভাবে আন্দোলনকে চালানো যায়। যখন এইটা জনসাধারণ করতে পারবে তখন নেতৃত্বকারী দলগুলির মধ্যে কোন্ দল তাদের সত্যিকারের সেই লড়াইতে ভাবের দিক থেকে, আদর্শের দিক থেকে যথার্থ নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের সেই পরিকল্পনায় মদত দিচ্ছে সেটা তারা দেখতে পাবে। আর জনসাধারণের এই দেখতে পাওয়ার মধ্য দিয়ে অবিপ্লবী দলগুলি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যবে। গণআন্দোলনগুলোকে আমাদের দল এইভাবে অ্যাপ্রোচ করে।

কিন্তু এই ধরনের গণআন্দোলন আমরা চাইলেই তো প্রতিদিন গড়ে ওঠে না। কোনো বিপ্লবী দল চাইলেই গড়ে ওঠে না। যে সমস্ত নকশালপন্থী বন্ধুরা 'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস', 'লড়তে হবে', 'কৃষকরা গ্রামে গ্রামে এলাকা দখল করে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি কর' বলে স্লোগান তুলছেন আর মনে করছেন বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে, তাদের আমি ভেবে দেখতে বলব, সত্যিই কি বিপ্লব শুরু হয়েছে, না এইভাবে বিপ্লব সম্ভব? ...কলেজ ইউনিয়নের মারদাঙ্গার মধ্যে কৃষিবিপ্লব ফেটে পড়ছে। বাস্তবে কৃষিবিপ্লবের দেখা নেই। কারণ এত সহজে এ জিনিস হয় না। তাঁরা যে কৃষিবিপ্লবের কথা বলছেন, তার সাথে আমাদের মতপার্থক্য আছে। আমরা মনে করি, ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, যে কৃষিবিপ্লবের কথা তাঁরা বলছেন তাও যদি তাঁদের করতে হয় তাহলে দীর্ঘদিন ধরে কর্মীরা যাকে বলছেন রুটিন ওয়ার্ক এবং বিরক্তিকর কাজ– এই বিরক্তিকর কঠিন পরিশ্রমের মধ দিয়েই তাঁদের এগোতে হবে। যত রকমের বুর্জোয়া মতবাদ, কুসংস্কার শ্রমিক আন্দোলন, চাষী আন্দোলনের মধ্যে ঢুকে আন্দোলনগুলোকে বিপথগামী করছে, ক্রমাগত তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে তার পর্দা খুলে দিতে হবে। ভাসাভাসা নয়, আদর্শের একটা পরিষ্কার ছবি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে। আপনাদের মনে রাখা দরকার 'বিপ্লব চাই', – এটা কোনো 'কন্সেপশন'ই ধারণাই নয়। 'লড়াই করতে হবে', 'লড়াইয়ের থেকেই নেতৃত্ব জন্ম নেবে' – এটাও কোনো কন্সেপশন নয়। কী সেই লড়াই, লড়াইয়ের শত্রু কে, মিত্র কারা, কতরকমের তার জটিল প্রক্রিয়া – কখনও সে প্রত্যক্ষ রাস্তায় সংগ্রামের রূপ নেয়, কখনও সে 'রিট্রিট' (পশ্চাদপসরণ) করে – অর্থাৎ কোন্ সময় লড়াই কী রকমের রূপ নেয় – এসব বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তুলতে হবে। আপনাদের মনে রাখতে হবে, এই লড়াই কখনও প্রচারধর্মী হয় – তখন সে একইসঙ্গে 'ক্যাডার রিক্রুট' করে, প্রচার করে, কাগজ চালায়, সংগঠন গড়ে তোলে। এ হ'ল সংগঠনের একটা স্তর। আবার এইগুলো করতে করতেই আন্দোলনের ইস্যুকে ভিত্তি করে যখন খানিকটা সংগঠন গড়ে ওঠে তখন প্রচার চালাবার সাথে সাথে আন্দোলনকে সে মাঠে-ময়দানে নিয়ে যায় শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়তে। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রশক্তি, তার দমনমূলক যন্ত্র এবং শোষকশক্তির চেহারাটা জনসাধারণকে দেখায়, সাথে সাথে অন্যান্য দল যারা বিপ্লবের নরম-গরম বুক্নি দেয়, সমাজতন্ত্রের কথা বলে তারা এই লড়াইয়ের সামনে কী 'অ্যাটিট্যুড' (মনোভাব) নেয় তা দেখায়। কারণ মতাদর্শগত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে যতক্ষণ কোন্ মতটা সঠিক জনসাধারণ না ধরতে পারছে ততক্ষণ বিপ্লবের রাস্তা পরিষ্কার হতে পারে না। যেমন, আমরা সমাজতন্ত্রের কথা বলি। বাংলা কংগ্রেসও সমাজতন্ত্রের কথা বলে। ফরোয়ার্ড ব্লকও সমাজতন্ত্রের কথা বলে। খোদ জহরলাল নেহেরুও সমাজতন্ত্রের কথা বলে গেছেন। আবার সিপিআই(এম) যে 'পিপল্স ডেমোক্রেটিক রেভোলিউশনে'র কথা বলছেন, পিপল্স ডেমোক্রেটিক রেভোলিউশন। অথচ, তাদের এই তিন পিপল্স ডেমোক্রেটিক রেভোলিউশনের নাকি কোনো মিল নেই। মানে রেভোলিউশন এক কিন্তু তিনটে তিনরকম। যদি ধরে নিই পিপল্স ডেমোক্রেটিক রেভোলিউশনই ভারতবর্ষের বিপ্লবের সঠিক লাইন, তাহলেও এই তিনটির মধ্যে কোন্টা ঠিক? এই ঠিক-বেঠিকের লড়াইটা জমে যায়, মানুষ তা নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে, বুঝতে থাকে ঠিক-বেঠিকের লড়াইটা তবেই বিপ্লবের রাস্তা পরিষ্কার হবে।

এই আদর্শগত-মতবাদগত সংঘর্ষ এড়িয়ে গিয়ে দেশে কিছুই হবে না। জনসাধারণ যে বলেন, 'যা হয় একটা কিছু করুন, আমরা আছি' – এ মনোভাব থেকে দেশে কিছুই হতে পারে না। এরকম মনোভাব থেকে মাঝে মাঝে যে ধরনের লড়াইগুলো দেশে হচ্ছে তাই হয়। সেই লড়াই কি শুধু আজ হচ্ছে? ১৯১৯ সাল থেকে মজুররা মারিকদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে প্রাণ দিয়ে আসছে। কত লোক ফাঁসিকাঠে গেছে, পুলিশের বিরুদ্ধে কলকাতায় কত 'ব্যারিকেড ফাইট' হয়েছে, কত গণআন্দোলন হয়েছে, কতবার পুলিশ-মিলিটারি সেই গণআন্দোলনে কলকাতাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু তার ফল কী হয়েছে? দেশের মানুষের অবস্থা দিনের পর দিন আরও খারাপ হয়েছে। এক পা-ও আমরা এগোতে পারিনি। আবার অনেকে আজ ভাবছেন, কিছুই হচ্ছে না। এই যে এত লড়াই হ'ল, ট্যাঙ্ক নামল, কলকাতা কতবার ব্ল্যাক আউট (যুদ্ধকালীন নিষ্প্রদীপ অবস্থা) হ'ল, পুলিশের সঙ্গে কত বোমা-পাটকেল নিয়ে লড়াই হ'ল – সেই লড়াইয়ের পরেও কেন আবার আজ মানুষ ভাবছে, কিছুই হচ্ছে না, লড়াই হচ্ছে না। কারণ, এই লড়াইগুলোর চরিত্র সেই 'স্পোরেডিক' (ইতস্তত বিক্ষিপ্ত), 'স্পন্টেনিয়াস' (স্বতঃস্ফূর্ত) – যেটা মার খেতে খেতে মানুষের মধ্যে ফেটে পড়ে মাঝে মাঝে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, বুঝুক না বুঝুক হঠাৎ একসময় সে আন্দোলনে ফেটে পড়ে। কিন্তু যেহেতু সঠিক নেতৃত্ব নেই যেহেতু বোঝবার ধৈর্য নেই, সংগঠন নেই, সেহেতু আন্দোলনগুলোকে স্পন্টেনিটি থেকে কখনোই মুক্ত করা যাচ্ছে না। এক একটা আন্দোলনের পর ফ্রাসট্রেশন মানুষকে ছেয়ে ফেলছে। অন্যদিকে যে দল সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে, আন্দোলনে সেই দলের নেতৃত্ব আজও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, সেই কারণ সে ইচ্ছে করলেও আন্দোলনকে কন্ট্রোল করতে পারছে না, সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করতে পারছে না। যদি পারত তাহলে লড়াইয়ের কৌশল এবং মূল লক্ষ্য মানুষকে বুঝিয়ে দিতে পারত, মানুষকে ফ্রাসট্রেশন থেকে মুক্ত করতে পারত এবং জনতার নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ারগুলো ধীরে ধীরে ধীরে গড়ে তুলে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারত।..."

উন্নয়নের তান্ডবের মধ্যে আমরা আছি

শেষ পৃষ্ঠার পর

উন্নয়নের সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে পরিবেশ। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের কথা শুনি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় এ নিয়ে। বাংলাদেশ সেখানে অংশগ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী যান, মন্ত্রীরা যান, বড় বড় আমলারা যান। সেখোনে গিয়ে তারা মূলতঃ বলেন যে, আমরা দায়ী না, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত, আমাদেরকে টাকা দিন। 'টাকা দিন' এই কথাটা ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সরকারের আর কোন মাথাব্যথা নেই। আর দেশে এসে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশকে যা বলা হয়েছে, ঠিক তার উল্টো কাজটা তারা করেন। এক্ষেত্রে তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব দেখা যায়। আমরা করবোই। কী করবো? আমরা উপকূল তছনছ করার জন্য যা করার দরকার তা করবো। প্রথমত, বাংলাদেশকে যেটা বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই সুন্দরবনকে শেষ করা। তারপর উপকূল ধরে আপনি আসতে থাকেন। পায়রা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হয়েছে উপকূলে। এর কারণে ওই এলাকার ফসল, মাছ সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। জিডিপি যখন হিসাব করা হয়, তখন এই ফলাফল হিসাবে ধরা হয় না। কিসের বিনিময়ে জিডিপি তৈরি হচ্ছে, সেটা দেখা হয় না। সমীকরণের তো দুটো অংশ থাকে। একটা অংশ আপনি দেখলেন যে, কী পেলেন। কী পেলেন দেখলেন কিন্তু তার বদলে কী হারালেন সেটা আপনি দেখছেন না। পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র জিডিপিতে কী যোগ করলো তার হিসাব হবে। কিন্তু তার বিনিময়ে প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশের যে ক্ষতি হলো সেটা বিয়োগ হবে না। তাই জিডিপির হিসাব থেকে কখনোই প্রকৃত চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। যে কোন দুর্যোগ পরবর্তীকালে যে পুনর্গঠন হয় তাতে জিডিপি বাড়ে। যেমন, সামনে শ্রীলংকার জিডিপি খুব দ্রুতগতিতে বাড়বে, ইউক্রেনের বাড়বে। কারণ রি-কনস্ট্রাকশন হবে। অনেক ধরনের পুঁজি সেখানে ঢুকবে, ফলে জিডিপি বাড়বে।

সরকারের মন্ত্রী-এমপি সকলের উন্নয়নের তৎপরতার মধ্যে দুই ধরনের বিষয় আপনারা দেখবেন। একটা হলো স্ট্রাকচার তৈরি করা। যে কোন ধরনের স্ট্রাকচার, যেটা মানুষ দেখবে। সেটার পরিণতি কী হবে তা বিবেচ্য বিষয় নয়। বাংলাদেশে এরকম সেতু আপনি পাবেন যেখানে সেতু আছে কিন্তু দুই পাশে কোন রাস্তা নাই। এটাও কিন্তু উন্নয়ন বাজেটের অংশ। বাজেটে সেটা দেখানো হয়েছে। কিন্তু ওটার দুই পাশে যে কোন রাস্তা নাই এটা নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নাই। এখানে উন্নয়ন মানে একটা কাঠামো দেখাতে হবে। কিছু নির্মাণ করতে হবে। এর নির্মাণের কারণ দুটো। এক হচ্ছে, এটা দেখা যায়। দুই হলো, নির্মাণের সাথে অনেক রকম স্বার্থ জড়িত। ঠিকাদারদের একটা বিপুল আধিপত্য আছে এদেশে। বড় বড় কোম্পানি চায় কনস্ট্রাকশন হউক।

ফলে একদিকে নির্মাণের দিকে আগ্রহ, আরেকটা আগ্রহ কেনাকাটার দিকে। পারচেজিং এ আগ্রহ। কোনটা আপনার দরকার বা দরকার নয়, সেটা কোন বিষয় না। যত বেশি দামের কেনাকাটা, তত বেশি কমিশন। কমিশন আর করাপশন। দুইটা মূল জায়গা তাদের ব্যবসার– একটা কেনাকাটা, আরেকটা নির্মাণ। এর মাধ্যমে সমস্ত বড় বড় ঠিকাদাররা বিশাল অংকের মুনাফা করছে।

শ্রীলংকার মত ঘটনা বাংলাদেশ সরকারকে একটা সিগন্যাল দিচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার তো এদিকে যাচ্ছিলই। বাংলাদেশ সরকার কোন রকম বিচার বিবেচনা ছাড়া হাজার হাজার কোটি টাকা লোন নিচ্ছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে এই লোন নেয়া হচ্ছে। চীন ঋণ দিচ্ছে, বিশ্বব্যাংক দিচ্ছে, এডিবি দিচ্ছে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে ঋণ নেয়া হচ্ছে।

এখন একটা ইঙ্গিত, একটা সিগন্যাল শ্রীলঙ্কা দিচ্ছে। একের পর এক ঋণনির্ভর প্রকল্প করতে থাকলে তার কী ভয়াবহ পরিণতি হয়– এটা তার দৃষ্টান্ত। সুতরাং বাংলাদেশের জন্য শ্রীলঙ্কা একটা আশীর্বাদ বলতে হবে। শ্রীলঙ্কা একটা সিগনাল দিলো। কিন্তু এ সিগনাল গ্রহণ করতে গেলে উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা তাদের বদলাতে হবে। এখন উন্নয়নের যে ধারণা আছে সেটা হলো যে কোন উপায়ে কেনাকাটা ও নির্মাণ এবং সর্বজনের সম্পদকে প্রাইভেট হ্যান্ডেট্রান্সফার করা। নদী, নালা, খাল, বিল, বন, উন্মুক্ত জায়গা সমস্তকিছুই তো সর্বজনের।

হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ। জীববৈচিত্র্য, উন্মুক্ত জলাভূমি সমুদ্র সৈকত নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর-বাঁওর, ঝিল, নদীর পাড়, পাহাড়, পর্বত– এগুলি সবই হচ্ছে সর্বজনের। এগুলো কোন একটিকে নিয়ে বাণিজ্য করার জন্য সরকার বা কেউ কোনো ব্যক্তিগত মালিককে দিতে পারবে না। সংবিধানের রেফারেন্স দিয়েই হাইকোর্ট এই রায় দিচ্ছে। অথচ সরকার সেই কাজটাই করছে সব জায়গায়।

কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে এক সেমিনারে এক আমলা বলেছেন যে, এখানে যে পাহাড় আছে, সে পাহাড় কেটে ফেললেই তো ভাল। অনেক জটিলতা কমে, পাহাড় ধ্বসও হয় না, আবার সেখানে আমরা বড় বড় ভবন করতে পারি। উন্নয়ন করতে পারি।

এইরকম দৃষ্টিভঙ্গি যাদের, যাদের এটা বোঝার ক্ষমতা নেই, নির্বোধ–তারাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। নির্বুদ্ধিতা, দায়িত্বহীনতা এবং লোভ– এই তিনটা যদি একসাথে হয়, তার সাথে যদি ক্ষমতা যুক্ত হয়, এ ধরনের লোকদের হাতে যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে কী অবস্থা হবে? সেটা বাংলাদেশে এখন হচ্ছে। আমাদের পাবলিক যা কিছু আছে তার সবকিছু প্রাইভেট ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যত রকম আয়োজন সব চলছে।

আমাদের সমুদ্র সৈকত একইসাথে প্রাকৃতিক দিক থেকে নন্দনতাত্ত্বিক এবং সম্পদের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধারণা করা হয় যে আমাদের সমুদ্র সৈকত একটা অবিচ্ছন্ন সমুদ্র সৈকত এবং এটাতে বিভিন্ন ধরনের খনিজ উপাদান আছে যেগুলো বহু ধরনের কাজে লাগে। বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক বহু ধরনের জিনিসপত্র হচ্ছে যেখানে অনেক খনিজ উপাদান প্রয়োজনীয়। পারমাণবিক বিভিন্ন ধরনের তৎপরতার জন্য খনিজ উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এটা হয়তো একটা সূচনা। প্রথমে তারা পতেঙ্গা সি বিচকে নিজেদের কন্ট্রোলের মধ্যে নিয়ে আসবে। কন্ট্রোলে নিয়ে আসার পরে কোন শর্ত মানার তাদের প্রয়োজন নাই। কারণ তারাই সরকারকে পরিচালিত করে। তারা তখন যা খুশি তাই করবে। ফয়েজ লেকের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সেখানে তারা যা খুশি তাই করছে। তখন সেটা শুধু ইজারা যারা থাকেনা, তাদের মালিকানা এবং কর্তৃত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাদের মালিকানাকে নিশ্চিত রাখার জন্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বানায়। তারা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী পালে, তারা পুলিশকে ব্যবহার করে, সরকারকে ব্যবহার করে এমন একটা কর্তৃত্ববাদী আবহাওয়া তৈরি করে যে তার ধারে কাছে আর কারো যাওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং পতেঙ্গা সি বিচে এখন তারা যা করছে এটা সূচনা। তাদের আরো বড় ধরনের পরিকল্পনা আছে। এটাতে যদি তারা সফল হয় তবে কক্সবাজার সি বিচ তারা ধরবে।

কক্সবাজার সি বিচের এমনিতেই খারাপ অবস্থা। কারণ গোটা এলাকাটা আবর্জনায় ভরা। কোন পরিকল্পনা নাই। অপরিকল্পিতভাবে একের পর এক ফাইভ স্টার হোটেল হচ্ছে সেখানে। সেখানে জমি লিজ দেয়া হচ্ছে, বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে প্লট বিক্রির। যারা আগে কক্সবাজারে গেছেন তারা বর্তমান সময়ে গেলে খুব তো হবেন বিপন্ন বোধ করবেন, ক্ষুব্ধ হবেন এই সমুদ্রসৈকতকে কিভাবে নষ্ট করা হয়েছে সেটা দেখে। অনেকদূর পর্যন্ত, একবারে হিমছড়ি ছাড়িয়ে গোটা এলাকাটাকেই কিছু ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। তারপর সেন্ট মার্টিন, একটা প্রবাল দ্বীপ, কিভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে এটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। সেন্টমার্টিনে ট্যুরিজম এর সাথে সম্পর্কিত একজন ব্যবসায়ী বললেন, অনেক দেন-দরবার করে, লেনদেন করে শেষ পর্যন্ত তারা আবার ব্যবসা করার অনুমতি পেয়েছেন। এখন মহাআনন্দে তাদের ব্যবসা চালাচ্ছেন। ইটের স্থাপনা করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ, করলে জরিমানা দিতে হয়। জরিমানা তারা দেন। পরিবর্তে এর কয়েকগুণ বেশি ব্যবসা করেন। ফলে জরিমানা দিতে তাদের কোন সমস্যা নেই।

এগুলোর পরিণতি হচ্ছে একটা পাবলিক রিসোর্সকে ধ্বংস করা হচ্ছে। এ ধরনের রিসোর্সকে কখনো টাকা পয়সা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। এর কোন আর্থিক মূল্য নেই। সুন্দরবনের আর্থিক মূল্য আপনি কিভাবে পরিমাপ করবেন? কত প্রজন্ম যে এটা থেকে লাভবান হয়েছে আবার সামনের কত প্রজন্ম লাভবান হবে। কারণ এটা ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স এর সাথে সম্পর্কিত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এটা দ্বারা উপকৃত হবে। তার আর্থিক মূল্য কিভাবে পরিমাপ করবেন। সুতরাং এটা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে দিয়ে দেওয়া চলে না। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, সবাই মিলে এই ছোট্ট একটা দেশকে লুটে নিচ্ছে। দেশটা ছোট, মানুষ বেশি, ভূমি ছোট –সেভাবে পাবলিক ইন্টারেস্ট এর উপযোগী করে পরিকল্পনা করতে হবে। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বেশি করতে হবে। হাউজিং ডেভলপমেন্ট করতে হবে। অনেক বেশি খোলা জায়গা রাখতে হবে। মানুষ বেশি, শিশু বেশি। অথচ ঠিক তার উল্টো কাজ হচ্ছে। পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় লবিস্ট গ্রুপদের পরামর্শ অনুযায়ী। কোন প্রকল্পের পেছনে দেশের ভেতরে ও বাইরে শক্তিশালী লবিস্ট গ্রুপ আছে সেটা বড় ব্যাপার।

মাথাপিছু জিডিপির হিসাব তো আপনারা জানেন। সরকার দেখাচ্ছে মাথাপিছু জিডিপি এতো হয়েছে। কিন্তু মাথাপিছু ঋণের হিসাব তো দেয়া হয় না। মাথাপিছু জিডিপি বাড়ছে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আয়ের কোনো পরিবর্তন নেই।

যাই হউক এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তেঁতুলতলা মাঠ হউক বা সিআরবি হউক, এরকম খণ্ড খণ্ড ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখি যে, শুধুমাত্র তখনই আমরা কোনকিছু রক্ষা যখন আন্দোলন থাকে। অনেকেই সিআরবির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর আগে জনগণের যে লড়াইটা করতে হলো সেটিকে অভিনন্দিত করা উচিত। কারণ জনগণের লড়াইটা হচ্ছে আসল। এই লড়াইটা যদি না থাকে, প্রতিরোধ যদি না থাকে তাহলে কিছুই রক্ষা করা যাবে না। আমি খুব আশঙ্কায় ছিলাম যে কখন না আবার প্রধানমন্ত্রী বলে বসেন যে সিআরবির ওখানে হাসপাতাল হলে অসুবিধা কি। আমাদের সময় কত হাসপাতাল হয়েছে। উনি বলে ফেলা মানেই তখন সরকারি দলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লোকরা সবাই চুপ হয়ে যান। তারা তখন আর কথা বলতে পারেন না। এই আশঙ্কার মধ্যে আমি ছিলাম। সিআরবির ক্ষেত্রে সেটা হয় নাই এ পর্যন্ত, সেটা ভাল খবর। কিন্তু সেটা আন্দোলন না থাকলে হতো না। প্রতিরোধ না থাকলে হতো না। সিআরবি নিয়ে আপনাদের সংগঠিত অবস্থান সেটা না থাকলে হতো না। সেটি আমাদের বার্তা দেয় যে, প্রথমত, সর্বজনের অধিকারের উপর আগ্রাসনমূলক প্রক্রিয়াকে থামানোর জন্য সংগঠিত হতে হবে। বাসদ (মার্কসবাদী)-কে ধন্যবাদ জানাই যে তারা বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে শুরু করেছেন। এখন আশা করি, এটাকে আরো সম্প্রসারিত করবেন। এগুলো না করলে আমরা নিজেদের সকল অস্তিত্বকেই হারাবো। পাশাপাশি আমাদের যেটা করতে হবে তা হল, উন্নয়নের যে তাণ্ডব, উন্নয়নের যে দর্শন, যে উন্নয়ন দর্শন এর সাথে রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদী শাসন সম্পর্কিত এটাকে প্রশ্ন করার মত জায়গা আমাদের তৈরি করতে হবে। আজকের সরকারের যে জবাবদিহিতা নাই, প্রধানমন্ত্রীর যে জবাবদিহিতা নাই–এটার কারণ শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী বা সরকার নয়। এটার কারণ যাদের কাছে জবাবদিহিতা করার কথা তারা প্রশ্ন করেন না। প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনে যারা যায় তারা প্রশ্ন করার বদলে ভক্তি প্রকাশ করে বক্তব্য দেয়, প্রশস্তি করতে থাকে, সারাক্ষণ তোয়াজ করতে থাকে। বুদ্ধিজীবী, লেখক যাদের প্রশ্ন করার কথা তারা যদি সারাক্ষণ তোয়াজ করতে থাকে, সারাক্ষণ প্রশস্তি করতে থাকে, প্রধানমন্ত্রীর সামনে তার স্তুতিগান করতে থাকে তাহলে জবাবদিহিতা কিভাবে হবে। জবাবদিহিতার শূন্যতা যখনই তৈরি হয়, যখন সরকারের মধ্যে কর্তৃত্ববাদ তৈরি হয় এবং সেই কর্তৃত্ববাদকে প্রশ্ন না করা বুদ্ধিজীবীদের আধিপত্য তৈরি হয়– তখনই এ ধরনের পরিবেশ তৈরি হয়। সুতরাং এ ধরনের আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণ করবে। আমরা আশা করি যে চট্টগ্রামে এটাও একটা উদাহরণ হিসেবে আসবে। আশা করি যে, সিআরবি নিয়ে আর কোনও জটিলতা তৈরি হবে না। সিআরবি থেকে হাসপাতাল সরে যাবে এবং পাশাপাশি এটাও আশা করি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে আরো উন্নত করা হবে যেন মানুষ সেখান থেকে সেবা পায়। আর এই পতেঙ্গা সৈকত এর উপর ভয়ঙ্কর যে আগ্রাসন, তাকে কিছু ব্যক্তি, কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেয়ার যে চক্রান্ত, তার বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে সম্মিলিত প্রতিরোধ তৈরি হবে। এটা শুধুমাত্র চট্টগ্রামের বিষয় নয়। পুরো বাংলাদেশের বিষয়। আমাদেরও দায়িত্ব। চট্টগ্রামের বাইরে সাধারণ মানুষদের যাতে বিষয়টা অবহিত করা হয়, বিষয়টার সাথে যুক্ত করা হয়– এ বিষয়ে আপনারা মনোযোগ রাখবেন। এই প্রত্যাশা রেখে আপনাদেরকে আবারো অভিনন্দন জানিয়ে আমার আলোচনার শেষ করছি, ধন্যবাদ।

সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র

শেষ পৃষ্ঠা

৮ম বর্ষ, ০৩ সংখ্যা, জুন ২০২২

রংপুরে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের বিশাল সমাবেশ

২০২২ ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠন রংপুরের উদ্যোগে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, আর্মি রেটে রেশন প্রদান এবং দ্রব্যমূল্যের অসহনীয় উর্ধ্বগতি হ্রাসের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৩০ মে রংপুরের গুপ্তপাড়া

বুদুবাবুর মাঠ থেকে দেড় সহস্রাধিক ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের একটি বিশাল মিছিল বের হয়। এরা সরকারের উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যাওয়া মানুষ। এখন ঘরবাড়ি ও জমি হারিয়ে রংপুরের ৩৩ টি ওয়ার্ডে উদ্বাস্তুর মতো আছেন। বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা শাখার সংগঠকরা এদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। দলের সংগঠকদের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে তারা গড়ে তুলেছেন সংগ্রাম কমিটি 'ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠন'। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের কর্মসূচী পালন করে আসছিলেন তারা। ৩০ মে'র মিছিল তারই ধারাবাহিকতা। মিছিলটি কাচারীবাজারে সমাবেশে মিলিত হয়। ভূমিহীন আন্দোলনের নেতা চাঁন মিয়ার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ভূমিহীন আন্দোলনের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সংগঠক শাহিদুল ইসলাম সুমন, জুবায়ের আলম জাহাজী, শাহনেওয়াজ শুভ, মর্জিনা বেগম, কোহিনুর বেগম, শেফালী খাতুন, রুপানা বেগম, ফাতেমা আক্তার, রোকেয়া খাতুন, লিয়ন খান প্রমূখ। সমাবেশে বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলার আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু ও সদস্যসচিব আহসানুল আরেফিন তিতু বক্তব্য রাখেন।

সংগঠকরা বলেন, পুনর্বাসন মানে শুধু থাকার ঘর নয়। সাথে কাজ ও খাদ্যের নিরাপত্তা দিতে হবে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের যে সকল খাসজমি প্রভাবশালীদের দখলে আছে তা উদ্ধার করতে ভূমিহীন-গৃহহীনদের পুনর্বাসন করতে হবে। অবিলম্বে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্যের দাম কমাতে হবে এবং শ্রমজীবী, নিম্ন আয়ের সকল মানুষকে আর্মিরেটে রেশন দিতে হবে। মানুষকে বাঁচাতে হলে এসব ন্যূনতম দাবি অবিলম্বে সরকারকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর ইতোমধ্যে পুনর্বাসন না করেই মাহিগঞ্জ সাতমাথার যে বস্তি ভাঙ্গা হয়েছে অবিলম্বে তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ পুনর্বাসন করতে হবে। অন্যথায় সামনের দিনে কঠোর কর্মসূচি দেয়ার হুশিয়ারি দেন নেতৃবৃন্দ।

বাসদ (মার্কসবাদী)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক
অনন্যসাধারণ কমিউনিস্ট বিপ্লবী
মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর
১ম মৃত্যুবার্ষিকী-তে

স্মরণ সভা

১৫ জুলাই ২০২২,শুক্রবার, বিকাল ৩টা
বিএমএ অডিটোরিয়াম, প্রেসক্লাব, ঢাকা

আলোচক:

প্রভাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক, এসইউসিআই(সি), ভারত

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ
অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক আবদুস সাত্তার
সমন্বয়ক, বাম গণতান্ত্রিক জোট ও
সাধারণ সম্পাদক ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ

ও বিভিন্ন বাম গণতান্ত্রিক দলের নেতৃবৃন্দ

সভাপতি:
মাসুদ রানা
সমন্বয়ক, বাসদ (মার্কসবাদী), কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম।

বাসদ (মার্কসবাদী)
কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম
২২/১ তোপখানা রোড(৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২২২৩৩৫৬৩৭৩, মোবাইল: ০১৭৪৮০২৭৩৬৭
ইমেইল: mail@spbm.org

উন্নয়নের তান্ডবের মধ্যে আমরা আছি

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ

পতেঙ্গা সি বিচ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাসদ (মার্কসবাদী) চট্টগ্রাম জেলা শাখা চট্টগ্রামের জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৩ মে চট্টগ্রামে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে চট্টগ্রামের বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে যুক্ত নাগরিকরা অংশগ্রহণ করেন ও বক্তব্য রাখেন। সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা আন্দোলনের সক্রিয় সংগঠক আনু মুহাম্মদ। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি 'সাম্যবাদ' এর পাঠকদের জন্য প্রকাশ করা হল। সম্পাদনার ভুলত্রুটির দায় আমাদের।

রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন নিয়ে আমরা বিভিন্ন সময় কথা বলেছি। উন্নয়নের তাণ্ডবের মধ্যে আমরা আছি। এটাকে তাণ্ডবই আমরা বলবো। উন্নয়ন শব্দটার অর্থটাই এখন পাল্টে যাচ্ছে। উন্নয়ন মানে কী? একটা দেশের উন্নয়ন মানে হচ্ছে সেই দেশের জনগণের আরাম বৃদ্ধি পাওয়া। আরাম মানে কী? আরাম মানে তার স্বস্তি বৃদ্ধি পাওয়া, তার আনন্দ বৃদ্ধি পাওয়া, তার শিক্ষা-চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়া। তার ফুসফুসটা একটু ভালো থাকা, তার মস্তিষ্কটা একটু ভালো থাকা, তার শরীরটা একটু ভালো থাকা। তার নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাওয়া। এজন্যই তো আমরা উন্নয়ন চাই। আমরা উন্নয়ন চাই তার কারণ, আমরা সমৃদ্ধিতে থাকতে চাই, আমরা শান্তিতে থাকতে চাই, নিরাপদে থাকতে চাই এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে আরও ভালো থাকে সেজন্য আমরা উন্নয়ন চাই। এখন উন্নয়ন যদি এরকম হয় যে সেটা আমাদের মাথার উপর একটা সার্বক্ষণিক বোঝা হিসেবে থাকে– আমরা শ্বাস নিতে পারবোনা, আমরা পানি খেতে পারবোনা, আমাদের শিশুরা নড়াচড়া করতে পারবেনা, বন্দীদশায় থাকবে এবং আমাদের যা যা সম্পদ সব চলে যাবে, বেদখল হয়ে যাবে বিভিন্ন লোকের হাতে। সেটাকে যদি কেউ উন্নয়ন বলে চালায় তাহলে আমরা সেটা কী করে মেনে নেব?

একটা সহজ পথ আছে এগুলোকে উন্নয়ন বলে চালানোর, সেটা হচ্ছে জিডিপি। জিডিপি'র কথা প্রায়ই আপনারা শোনেন। বলা হয়– জিডিপি বাড়ছে, জিডিপি বাড়ছে, জিডিপি বাড়ছে। এটা এখন অনেকটা শোরগোলের মতো। মাথাপিছু জিডিপি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কালকে আপনারা শুনলেন যে, বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি প্রায় তিন হাজার ডলারের কাছাকাছি হয়েছে, ২ হাজার ৮০০ এর উপরে। শ্রীলঙ্কার কিন্তু বাংলাদেশের চাইতেও মাথাপিছু জিডিপি বেশি ছিল। প্রায় ৪ হাজার ডলারের মতো ছিল। শ্রীলঙ্কা সবদিক থেকেই বাংলাদেশের চাইতে অনেক ভালো অবস্থানে ছিল। শিক্ষা, চিকিৎসা সব ক্ষেত্রে। সেই শ্রীলঙ্কার অবস্থা আজকে আপনারা দেখেন। পরিস্থিতি কী? জিডিপি হচ্ছে উন্নয়নের ক্ষেত্রে খুবই বিভ্রান্তিকর একটা পরিমাপক। এই যে পতেঙ্গা সি-বিচ ব্যক্তির দখলে চলে যাবে, তারা এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, মানুষ ঢুকতে পারবেনা; কিংবা সিআরবি'র ক্ষেত্রে যে চেষ্টা করা হচ্ছে, একটা প্রাকৃতিক জায়গাকে কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেয়ার চেষ্টা চলছে। এরকম ব্যবস্থা যতো হবে, ততোই কিন্তু জিডিপি বাড়বে। আপনারা খেয়াল করবেন, জিডিপি বাড়ার সাথে মানুষের, জনগণের, সর্বজনের সমৃদ্ধি কিংবা তাদের নিজেদের বিকাশ কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি কিংবা আনন্দ বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক নেই। মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলে, বিপদে ফেলে, নিরাপত্তা হরণ করে, তার সম্পদ দখল করে, জিডিপি বাড়তে পারে। কেনাবেচা যতো বাড়বে, ততো জিডিপি বাড়বে। সর্বজনের জায়গা যতো দখল হবে, ততো জিডিপি বাড়বে। যেমন, সুন্দরবন বিনাশের যতো আয়োজন চলছে এগুলো থেকে জিডিপি বাড়ছে। এই যে এখন ফ্লাইওভার হচ্ছে, এটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে–এতে জিডিপি বাড়ছে।

০৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী), কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স-৯৫৭৬৩৭৩। website: www.spbm.org, e-mail: mail@spbm.org